الفوز الكبير
আল ফাউযুল কবীর
(বাংলা)
কুরআন ব্যাখ্যার
মূলনীতি
শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ)

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহ্লভী

আল-ফাউযুল কবীর ফী উসুলিত তাফসীর

(বাংলা)

কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি

অনুবাদক

অধ্যাপক আখতার ফারুক

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল

সাবেক মুহাদ্দিস মাদ্‌রাসায়ে নুরিয়া

আশরাফাবাদ, ঢাকা

কুতুব খানায়ে রশিদিয়া

৫৫/২ চক সার্কুলার রোড, ঢাকা-১২১১

ফোনঃ ৭৩১৭৬০৫

কুরআন ব্যাখ্যার মুলনীতি

মূলঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী

অনুবাদক ঃ
অধ্যপক আখতার ফারুক

প্রকাশক ঃ
হাফেজ মাওঃ নোমান ও মাওঃ ইমরান

প্রথম মুদ্রণ ঃ ১৯৯৩ইং
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ২০০৪ইং

মূল্য ঃ ৯০.০০ টাকা

জে এইচ কম্পিউটার

আল-ফাউযুল কবীর ফী উসূলিত তাফসীর (বাংলা) মূল ঃ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী কুরআন ব্যাখ্যার মুলনীতি অনুবাদক ঃ অধ্যপক আখতার ফারুক , সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল
AL-FOWGUL KABIR FE USLAL TAFSIR, SHA ULE ULLAH BANGLY, AKHTR FARQU, ADTH, ISLIMEL PRICE: 90 TK.
55/2 Chakbazar, DHAKA.

প্রকাশকের কথা

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ)এর খ্যাতনাম গ্রন্থ "আল ফাউযুল কবীর ফি উসুলিত তাফসীর নুতন করে কোন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেনা। জনাব অধ্যপক আখতার ফারুক উক্ত কিতাবের অনুবাদ করে নাম দিয়েছেন "কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি।

অনেক পূর্বেই এর পহেলা সংস্কারণ নিঃশেষিত হয়। বইটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই কুতুব খানায়ে রশিদিয়া, ঢাকা। পূর্ণমূদ্রণে হাত দেয় এবং ১৯৯৩ সনে প্রথম প্রকাশ করে।

বর্তমানে বই খানার কপি শেষ হয়ে যাওয়ায় নুতন ভাবে প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই নুতন ভাবে কম্পোজ করে প্রুব দেখতে গিয়ে অনুবাদের মধ্যে বেশ কিছু ক্রটি ধরা পড়ে। আমাদের পিতা হযরত মাওঃ মুহাম্মাদ ইসমাইল সাহেব, সাবেক মুহাদ্দিস, মাদরাসায়ে নুরিয়া, ঢাকা। মূল কিতাব সামনে রেখে ভুল-ক্রটি গুলি সংশোধন করেন এবং বেশ কিছু স্থানে শিরনাম, হাওলা সহ কিছু বিষয় সংযোজন করেন। যার কারনে বর্তমান সংস্কারণটি পূর্বের তুলনায় সুন্দর ও সমৃদ্ধ হয়েছে। গবেষণা মূলক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী প্রকাশের যে দায়িত্ব কুতুব খানায়ে রশিদিয়া কাঁধে নিয়েছে এ বইটি প্রকাশের মাধ্যমে তার কিছুটা পালিত হল বলে মনে করি।

আশা করি মহা সাধকের এই- অমর গ্রন্থের অনুবাদও তার মূল গ্রন্থের ন্যায় উপকারী ও জন প্রিয়তা হাসিল করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ পাক দয়া করে এই কিতাবের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে নাজাতের অসিলা করে দিন। আমীন!

বিনীত

নোমান ও ইমরান

১২/১২/১৪২৪হিঃ

৩/২/০৪সন

অনুবাদকের বক্তব্য

অনুবাদকের অনুবাদকার্য সংক্রান্ত কিছু কথা থেকে যায়। এখানে আমি সেটাই ব্যক্ত করতে চাচ্ছি মাত্র।

এ দেশের শিক্ষিত সমাজে হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লভী (রাঃ) পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না আদৌ। তেমনি রাখে না তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'আল্ ফাওযূল কবীর ফী উসুলিত্ তাফ্সীর'। আরবী, ফার্সী ও উর্দূ তিন ভাষাতেই এ গ্রন্থ গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে আছে। প্রায় সব দেশেরই ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরের ক্লাসসমূহে এ গ্রন্থ পাঠ্য হয়ে চলেছে বহু দিন থেকে। আমি তার বাংলা অনুবাদ করে নাম দিলাম 'কুরআন ব্যাখ্যার মুলনীতি'।

এ গ্রন্থ কূপে সমুদ্রে এসে ঠাই নিয়েছে। তাই তার মন্থন করে তলদেশ থেকে মনিমুক্তা আহরন করে সবাইকে উপহার দেয়া যেন তেন ডুবুরির কাজ নয়। সেক্ষেত্রে আমার মত নগণ্য ডুবুরী যদি কিছুমাত্র সফলতাও অর্জন করে থাকে, তা নেহাত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মুল গ্রন্থকারের অমর প্রেরণা শক্তির ফল শ্রুতি বৈ আর কিছুই নয়।

তাই এ অনুবাদক তার অনুবাদ কার্যের জন্যে কোনই কৃতিত্ব বা প্রশংসার দাবী রাখে না। প্রশংসা ও কৃতিত্বের মালিক– মোখতার একমাত্র বিশ্ব প্রতিপালক। অনুবাদক বরং তার দ্বারা বাংলা ভাষায় এ বিরাট খেদমতটি প্রথম সম্পাদনের সুযোগ দানের জন্যে আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

এ কার্যটি দ্বারা বাংলাদেশর মুসলিম সমাজের কাহারও যদি কুরআন বুঝার কিছুমাত্র সুযোগ-সুবিধা ঘটে, তা হলেই শ্রম সার্থক মনে করব। মহান আল্লাহ্ আমার এ শ্রমটি তাঁর দরবারে সেবা হিসেবে গ্রহণ করলে জীবন সার্থক ভাববো।

আরজ গুজার

আখতার ফারুক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

লেখকের আসল নাম ওয়ালিউল্লাহ্, উপাধি কুতুবুদ্দীন ও হুজাতুল ইসলাম। তার ডাক নাম শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহল্ভী, এই নামেই বিশ্বে তিনি ক্ষ্যাতি লাভ করেন। তার পিতার নাম শাহ্ আব্দুর রহীম। বংশ পরিচয় পিতার দিকদিয়া হযরত ওমরে ফারুক (রাঃ), মাতার দিকদিয়া মুসা কাজিম (রাঃ) পর্যন্ত পৌছে। জন্ম ১৭০৪ খৃষ্টব্দে মুতাবিক ১১১৪ হিজরী সনের ১৪ই শাহওয়াল বুধবার দিল্লিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১১৭৬ হিজরী সনের ২৯শে মুহাররম মাসে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে যোহরের সময় দিল্লিতে ইন্তেকাল করেন।

পাঁচ বছর বয়সেই কুরআন শিক্ষার জন্য তাকে মকতবে ভর্তি করা হয়। সাত বৎসর বয়সে তিনি কুরানের হাফেজ হন। হেফজ শেষ করার সাথে সাথে সাত বছর বয়স থেকে ফার্সি পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। দশ বছর বয়সে শরহে মুল্লাজামী আয়ত্ত করেন।

মাত্র তিন বছরে তিনি নাহু ছরফে এমন দক্ষতা অর্জন করেন যে, উক্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞগন পর্যন্ত তার সামনে এসে মাথা নত করতে বাধ্য হতেন। লোগাত, বালাগাত, ফেকাহ, হাদীস, তফসীর, তাসাওফ, আকায়েদ, মান্তেক চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন, অংক, জ্যোতি বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক কিতাব তার পিতা শাহ্ আঃ রহীম সাহেব (রঃ) এর নিকট পড়েন। মাত্র পনর বছর বয়সে এই সমস্ত বিষয়ের উপর পান্ডিত্য অর্জন করেন। পুঁথিগত সকল বিদ্যা সমাপ্ত করে তিনি তার পিতার হাতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের জন্য বাইয়াত হন। তিনি আধ্যাত্মচর্চার ক্ষেত্রে এরূপ দক্ষতা অর্জন করেন যে অল্প সময়ের ভিতর তিনি এই জগতেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। আধ্যাত্মিক তালীম শেষ হলে তার পিতা তার মাথায় দস্তারে ফযিলত বেধে দেন। এবং তাকে সুলুকের তালীমদানের অনুমতি প্রদান করেন।

শাহ্ সাহেব কে তার পিতা চৌদ্দ বছর বয়সে সুন্নাতে শা'দীর কাজ সম্পান্ন করান।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রঃ) ছিলেন ভারত বর্ষের জ্ঞানের জগতের শ্রেষ্ট নক্ষত্র। শুধু তাই নয় তিনি ছিলেন জ্ঞান পিপাষুদের তৃষ্ণা নিবারনের হাউজে কাওসার।

কুরআন ব্যাখ্যার মুলনীতি

আল্লাহ্ তায়ালা পাকভারত উপ মহাদেশে হাদিস ও সুন্নাতে রসুল এর প্রচার, প্রসার, ও উন্নতী শাহওয়ালিউল্লাহ (রঃ) ও তার সন্তান-সন্ততী শিষ্য, সাগরেদদের দ্বারা ঘটিয়েছেন। ভারতবর্ষে হাদিসের সনদ শাহ্ সাহেবের উপর নির্ভর শীল । এ উপমহাদেশে শাহ্ সাহেবের অবস্থান জান্নাতের তুবা বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল শাহ সাহেবের বাড়ীতে আর শাখা প্রশাখা প্রতি মুসলিমের ঘরে ঘরে।

জ্ঞানের প্রতি শাখায় রয়েছে তার লিখনী, বিশেষ করে হাদীস তফসীর উভয় শাস্ত্রের মূলনিতীর উপরে তার লিখনীই যুগ শ্রেষ্ঠ।

১। ফার্সি ভাষায় তার কোরআন তরজুমা, আরবী কাব্যের সাদৃস্যে। (২) আল ফাউযুল কবীর ফি উসূলিত তফসির । (৩) আল ইরশাদ ইলা মুহিম্মাতি ইলমিল ইসনাদ। (৪) হুজ্জুতুল্লাহিল বালিগা। (৫) ইকদুল যীদ ফি আহকামিল এজতিহাদি অততাকলিদ (৬) আল আনছাফ ফি বয়ানি সাবিলিল ইখতিলাফ (৭) ইযালাতুল খিফা আন খিলাফাতিল খুলাফা (৮) আত তাফহিমাতুল ইলাহিয়্যা (৯) আল মুসাফ্ফা শরহে মুয়াত্তা (ফার্সি) (১০) আল মুসাওয়া শরহে মুয়াত্তা (আরবী) এ ছাড়াও চল্লিশের উপরে রয়েছে শাহ সাহেবের লিখনী কিতাব।

ভূমিকা

এ অক্ষম বান্দার ওপরে আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃপা ও অনুকম্পা রয়েছে। তার ভেতরে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল মহাগ্রন্থ কুরআন বুঝবার ক্ষমতা দান। আল্লাহ্র রসূলের ও অশেষ ঋণ রয়েছে এ নগন্যের ওপরে। তার ভেতরে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, পবিত্র কুরআন প্রচারের ব্যবস্থা। রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের কুরআন শিখিয়েছেন। তাঁরা পরবর্তী যুগের লোকের কাছে তা পৌছিয়ে গেলেন। এভাবেই কুরআন প্রচারের ধারা অব্যাহত থাকে। এমনকি মৌখিক বর্ণনা ছাড়া লেখনীর ধারা বয়েও তা এ দীন বান্দা পর্যন্ত পৌছে গেছে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا وَشَفِيْعِنَا
اَفْضَلَ صَلٰوتِكَ وَاَيْمَنَ بَرَكَاتِكَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَعُلَمَاءِ
اُمَّتِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

"হে আল্লাহ্! তোমার সেরা অনুগ্রহ ও কল্যাণের প্রতিভু এবং আমাদের শাফায়াতকারী ও নেতা মহানবীর উপরে অনুগ্রহ বর্ষণ কর। তেমনি তাঁর ছাহাবা, বংশধর ও উম্মতের সব আলেমদের ওপরে অনুগ্রহ বর্ষণ কর। হে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু। তোমার অসীম দয়ায় তা কর।

আল্লাহ্র হামদ্ ও রসূলের ওপর দুরূদ পাঠের পরে আবদুর রহীম তনয় দীন ওয়ালিউল্লাহ্র বক্তব্য এই ঃ আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর পাক কালাম বুঝবার দ্বার আমার জন্যে মুক্ত করেছেন, তখণ আমি এমন কয়েকটি জরুরী নিয়ম নীতি সম্বলিত একখানা বই লেখার সংকল্প নিলাম যেন আল্লাহ্র কৃপায় সেই কয়েকটি মাত্র নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেই কুরআন বুঝতে ইচ্ছুকদের পথ সুগম হয়ে যায়। যদিও আজ পর্যন্ত অনেকে কুরআন অধ্যয়নে জীবনপাত করেছে, এমনকি বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারকদেরও অনেকে সাহায্য নিয়েছে, তথাপি তাদের খুব কম লোকেরই এসব নিয়ম নীতি জানা থাকার কথা।

আমি এ পুস্তিকাটির নাম দিলাম, 'আল-ফাউযূল কবীর ফী উসুলিত তাফসীর' (কুরআন ব্যাখ্যার মুলনীতিতে বিরাট সাফল্য)।

সব ব্যাপারেই আমরা আল্লাহ্র কাছ থেকে শক্তি পেয়ে থাকি। তাই তাঁর ওপরেই আমি নির্ভর করছি। তিনিই আমার উত্তম অভিভাবক এবং তিনিই আমার জন্যে যথেষ্ট।

معنى التفسير : তফসির এর আভিধানিক অর্থ আলোকিত করা ও ব্যাখ্যা করা। পরিভাষায় "তফসির" ঐ জ্ঞান এর নাম যাহাতে কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। মানুষের সাধ্য-সমর্থ অনুপাতে।

موضوع : 'কালামুল্লাহ' আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা বুঝান হিসাবে।

غرض : আল্লাহ প্রদত্ত দিশা অনুযায়ী চলা, মজবুত রশী দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা এবং চরম ও চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন করা।

فضائل:

(১) আল্লাহ তায়ালা নিজ কালাম। কুরআন শরীফের বাখ্যার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (সূরা ক্বিয়ামাহ ১৯) এই আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা নিজ কালামের প্রথম মুফাসসির, আর এটুকই তফসিরের মর্যদার জন্য যথেষ্ট।

(২) কুরআনের তফসির (ব্যাখ্যা প্রদান) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসালল্লামের অজিফা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (সূরা নাহাল ৪৪) হুজুর (সঃ) নিজের কথা ও কর্মের দ্বারা উম্মতের সামনে কুরআনে পাকের তফসির পেশ করেছেন। সেই হিসাবে নবী (সঃ) কুরআনে পাকের দ্বিতীয় মুফাসরি এটাও তফসীরের মর্যদার জন্য যথেষ্ট।

(৩) হুযুর পুর নুর (সঃ) নিজ চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এর জন্য দুয়া করেছেন اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ (বুখারী শরীফ) অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ (হাকিম)। আর শ্রেষ্ঠ সাহাবী ফকীহে উম্মত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর শ্রেষ্ঠ মুফাসির হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। نِعْمَ تَرْجُمَانُ الْقُرْاٰنِ اِبْنُ عَبَّاسٍ (হাকিম)। ইহাও তফসির শ্রেষ্ঠ বিষয় হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

(৪) কুরান শিক্ষা গ্রহনকারী ও প্রদান কারী কে হাদীসে সর্বোত্তম ব্যাক্তি বলা হয়েছে। خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهُ এই হাদীসের -ব্যাপকতার মধ্যে শব্দ ও অর্থ উভয়টা অন্তর্ভুক্ত। তফসীর শ্রেষ্ঠ বিষয় হওয়ার জন্য এ হাদীসই যথেষ্ঠ।

আহকাম

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী

পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু পাঁচটি অধ্যায়ে সিমাবদ্ধ। **প্রথম অধ্যায় ঃ পঞ্চইলমের** বর্ণনা। ১। ইলমুল আহকাম। ২। ইলমুল জদল। ৩। ইলমুত তায্কির বি-আলা-ই-ল্লাহ। ৪। ইলমুত তায্কির বি-আইয়্যমিল্লাহ। ৫। ইলমুত তাযকীর বিল-মাউত। আর কুরআন অবতির্ণ ও হয়েছে এই পঞ্চইলমের বর্ণনার জন্য। **দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ** কুরআনের আয়াতের দুর্বোধ্যতার কারনসমূহ ও তার সমাধানের বর্ণনা। **তৃতীয় অধ্যায় ঃ** কুরআনের চমক প্রদ ও আশ্চার্য বর্ণনা রীতি। **চতুর্থ অধ্যায় ঃ** তফসীরের পদ্ধতীর বর্ণনা এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনদের মধ্যে তফসীর নিয়ে বিরোধের মীমাংসা। **পঞ্চম অধ্যায় ঃ** কুরআনের দুর্বোধ্ধ স্থান সমূহের ব্যাখ্যাদান, শানে নুযূল ইত্যাদির সমাধান দানে তফসীরকারদের জন্য যে পরিমান জ্ঞান অত্যাবশ্যক তার বর্ণনা।

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চ ইল্‌ম

কুরআনে যে সব জ্ঞান ও উপদেশপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য বর্ণিত হয়েছে, তা পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে।

(১) ইসমুল আহ্‌কাম বা সংবিধান জ্ঞানঃ

অর্থাৎ উপাসনা, কায়-কারবার, ঘর–সংসার, রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি যে কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব (অবশ্য করনীয়) মন্‌দুব (প্রশংসনীয়) মুবাহ্‌ (বৈধ), মাকরুহ (অপচন্দনীয়) এবং হারাম (অবশ্য পরিত্যাজ্য) বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান। এ জ্ঞান যারা সম্যক ও সবিস্তারে অর্জন করে, তাদের ফকীহ্‌ (আইনজ্ঞ) বলা হয়।

(২) ইলমুল জদল (মুখাসামা) বা ন্যায় শাস্ত্র জ্ঞান ঃ

অর্থাৎ ইয়াহূদী, নাসারা মুশরিক ও মুনাফিক এ চারটি পথভ্রষ্ট দলের সাথে বিতর্কে পারদর্শিতা লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান। এ জ্ঞানের বিশ্লেষণ দানের দায়িত্ব যাঁদের, তাঁরা হলেন মুতাকাল্লিমীন।

(৩) ইলমুত্‌ তাযকীর বি-আলা-ইল্লাহ বা স্রষ্টা–তত্ত্ব জ্ঞানঃ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবদান ও নিদর্শন সম্পর্কিত জ্ঞান। এতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রাপ্ত বান্দার অভিজ্ঞান, পরন্তু স্রষ্টার সর্বাবিধ গুণাবলীর পরিচয় সম্পর্কিত বর্ণনা গুলো রয়েছে।

(৪) ইল্‌মুত্‌ তাযকীর বি আইয়্যামিল্লাহ বা সৃষ্টি– তত্ত্ব ঃ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান। এতে অনুগতদের পুরস্কার ও অবাধ্যদের শাস্তি সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(৫) ইল্‌মুত্‌ তাযকীর বিল- মউত বা পরকাল– জ্ঞান ঃ

অর্থাৎ মৃত্যু ও তার পরবর্তীকালের অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান। এতে পুনরুত্থান, একত্রীকরণ, হিসাব-নিকাশ ও বেহেশ্‌ত-দোযখ সম্পর্কিত বর্ণনা গুলো এসে যায়। এসব ব্যাপারে যাঁরা সবাইকে কুরআন ও হাদীস থেকে বাণী আয়ত্ত করে সতর্ক করে থাকেন, তাঁদের ওয়ায়েয বা সতর্ককারী বলা হয়।

কুরআনের বর্ণনা রীতি ঃ কুরআন পাক এসব জ্ঞান দানের ব্যাপারে সেকালের আরবদের রীতি অনুসরণ করেছে। পরবর্তীকালে আরবদের বর্ণনা রীতির সাথে তার মিল নেই কোথাও। বস্তুত সংবিধান সম্পর্কিত আয়াত বর্ণনার

—২

বেলায় সংক্ষেপিকরণের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। তাতে নীতি নির্ধারকদের মতো অহেতুক চুলচেরা বিশ্লেষণ ও মীমাংসার দায়ে বর্ণনাকে দীর্ঘতর করা হয়নি।

ইলমুল মুখাসামা সম্পর্কিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তাআলা সর্ব বাদীসম্মত নীতি ও কল্যাণকর উপদেশের সহজ সরল পন্থা অবলম্বন করেছেন। তর্ক বিশারদের মত যুক্তির মারপ্যাচে ধাপে ধাপে এগোবার দরাজ পথ অনুসরণ করেন নি। এমনকি অধুনা প্রবন্ধকারদের মত বিভিন্ন কথার গাঁথুনী রচনা করে একটি কথা বুঝাতে সময় ব্যয় করেন নি। পরন্তু বন্দাদের জন্যে যখন যেখানে যা যতটুকু প্রয়োজন ভেবেছেন, এমন কি আগ-পর ধারাবাহিকতার তোয়াক্কা না রেখে তা বলে গেছেন।

অবতরণ কার্য-কারণ ও ব্যাখ্যাকার ঃ সাধারণ তাফসীরকারদের রীতি হল এই- যখনই তাঁরা কোন আয়াতের ব্যাখ্যা করতে যান, হোক তা মুখাসামা কিংবা আহ্কাম সম্পর্কিত, তার সাথে অবশ্যই তাঁরা কোন না কোন ঘটনা বা কাহিনী জুড়ে দেন। এবং তাঁরা ভাবেন, এ কাহিনী বা ঘটনাটিই আয়াতটির অবতরণের একমাত্র কারণ। অথচ এ কথা সর্ববাদি সম্মত যে, কুরআন শুধু মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতা দান ও তাদের কুসংস্কার ও কুকার্য থেকে উদ্ধার করার জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই তার বিভিন্ন ধরনের আয়াত অবতীর্ণ হবার ভিন্ন ভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন- মুখাসামার আয়াতগুলো এসেছে ভ্রান্ত বিশ্বাস বা কুসংস্কার দুর করার জন্যে তেমনি আহ্কামের আয়াতগুলো মানুষের কার্যধারার ভুলগুলো শুধরে দেবার জন্যে নাযিল হয়েছে। তাদের ভেতরকার জুলুম নিপীড়নের স্রোত বন্ধ করাই সেগুলোর উদ্দেশ্য। আর তাযকীর বি-আলা ইল্লাহ্ ও বি-আইয়্যামিল্লাহ্ সম্পকির্ত আয়াতগুলো নাযিলের মুলে রয়েছে আল্লাহ্র নিদর্শন ও অবদান গুলোর ব্যাপারে মানুষের উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য। এমনকি, নিজেদের কার্যকলাপের ভাল-মন্দ বা শুভ-অশুভ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। তেমনি অজ্ঞ তারা মৃত্যুর পরবর্তী অধ্যায় সম্পর্কে। তাই এ সবের আলোকপাত করে কতগুলো আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

বস্তুত ব্যাখ্যাকাররা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ নিয়ে যতখানি মাথা ঘামিয়ে থাকেন, তা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তার তাৎপর্যকে ভিত্তি করে কুরআন অবতীর্ণ হয়নি। অবশ্য যে সব আয়াতে হযরত কিংবা তাঁর পূর্ববর্তীকালের কোন ঘটনা সম্পর্কে ইংগিত দান করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রসংগে সে সব ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। কারণ শ্রোতারা সে আয়াতের মর্ম বুঝতে গিয়ে ইংগিতময় ঘটনাটুকু না জানা পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হতে পারে না। তাই প্রয়োজন হচ্ছে এই আলোচ্য ইল্মগুলো এরূপ রীতিতে বিশ্লেষণ করা যেন তাতে প্রাসংগিক খুটিনাটি ব্যাপার ও ঘটনাবলী বর্ণনার আবশ্যকতা দেখা না দেয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আয়াতে মুখাসামা

কুরআন পাকে মুশ্‌রিক (অংশীবাদী) ইয়াহুদী ও মুনাফিক (ভন্ড-মুসলিম) এ চার দলের ধারণা ও কার্যকলাপের অযৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো দু ধরনের।

১। শুধু তাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলো তুলে ধরে সেগুলোর পরিণতি দেখানো হয়েছে এবং সেগুলোকে খারাপ বলে ধারণা দেয়া হয়েছে।

২। তাদের সন্দেহ গুলোর উল্লেখ করে যুক্তি ও উপমা-উপদেশের সাহায্যে সেগুলোর অবসান ঘটানো হয়েছে।

মুশরিকদের ধর্ম বিশ্বাস ঃ

মুশরিকরা নিজদের 'হানিফ' (সঠিক পথানুসারী) বলে প্রচার করত এবং হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর ধমানুসারী বলে দাবী করত। কারণ, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর ধর্মানুসারীদেরই 'হানিফ' বলা হত। ইব্‌রাহীম ধর্মের নির্দেশগুলো নীচে দেয়া গেল ঃ

১। কা'বা ঘরে হজ্জ পর্ব উদযাপন।

২। কা'বার দিকে ফিরে উপাসনা করা।

৩। নসব (বংশ-ধারা) কিংবা রাযা'আত (স্তন্য পান) দ্বারা যে সব নারী হারামের পর্যায়ে পড়ে, তাদের বিয়ে হারাম বলে গ্রহণ করা।

৪। স্ত্রী-সহবাসে গোসল ফরয হওয়া।

৫। খাতনা করা।

৬। মর্যাদার মাসগুলোকে ও কা'বার পবিত্রতাকে যথাযথ মর্যাদা দান করা।

৭। কুরবানী করা।

৮। জীব-যবেহ্ করে খাওয়া।

৯। হজ্জের মওসুমে কুরবানী করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনা।

১০। প্রকৃতি সম্মত কার্যাবলী সম্পাদন।

মূলত দীন-ই-ইব্‌রাহীমে ওযু, নামায, সূর্যোদয় থেকে রোযা, ইয়াতীম ও মিসকীনের সদকা, বিপদে সহায়তা ও আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করার বিধানও ছিল। সেগুলো পালন করাকে তারা একদিক গৌরবজনক ও প্রশংসানীয় বলে ভাবত।

মুশরিকরা এগুলোকে এমনভাবে বেমালুম হজম করেছে যে, মনে হয় কোন দিনই এসব সে ধর্মে ছিল না। এভাবে হত্যা, চুরি, যিনা, সুদ ও আত্মসাৎ ইত্যাদি

ইব্রাহিমী ধর্মে হারাম ছিল। এগুলো অনুসরণ করা নিন্দনীয় ও ধিকৃত কাজ ছিল। কিন্তু মুশরিকরা প্রকাশ্যে এগুলো করে চলল। এমনকি মনে যা চায় তাই করে চলল।

ইব্রাহিমী ধর্মের মুল বিশ্বাস সমুহ ও মুশরিক দল ঃ

একক আল্লাহ্র বিশ্বাস এবং এ ও বিশ্বাস করা যে, তিনিই আসমান-যমীনের স্রষ্টা, বড় বড় ঘটনা ও ব্যাপারের মুল উদ্গাতা ও নিয়ন্তা, নবী প্রেরণ ও বান্দাদের কর্মফল দাতা এবং যে কোন বিবর্তন- বিপর্যয় তাঁরই ইংগিতে দেখা যায়। ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠ বান্দা বলে বিশ্বাস করা এবং তাঁদের সম্মানের পাত্র ভাবা-এসব বিশ্বাসই সে ধর্মে বর্তমান ছিল। সে ধর্মের নিদর্শনগুলো থেকেও তা বুঝা যায়।

কিন্তু মুশরিকরা এসব মূল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এমন সব সংশয়ের ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল, যেগুলো জন্ম নিয়েছিল সে সবের অসম্ভাব্যতা ও দুর্বোধ্যতা বোধ থেকে। এর ফলে তাদের যে বিভ্রান্তি দেখা দিল, তাতে নীচের ব্যাপারগুলোর আত্মপ্রকাশ করল ঃ

শির্ক্ (অংশীবাদ) তাশবীহ্ (উপমা-কামনা), তাহ্রীফ (বিকৃতি) পরকাল অস্বীকার, শেষ নবীর নবুওতকে অসম্ভব ভাবা, জুলুম ও ব্যভিচারের ব্যাপ্তি কুসংস্কার অনুসরণ, ইবাদতের বিলোপ ঘটান ইত্যাদি। এসবের বিশ্লেষণ নিম্নে দেয়া হল ঃ

(১) শির্ক

শির্ক অর্থ হচ্ছে এই যে, সব গুণাবলী কেবল আল্লাহ্র জন্যেই নির্দিষ্ট, সে সব গুণে অন্য কাউকে গুণান্বিত ভাবা। যেমন, কাউকে পৃথিবীতে যা-ইচ্ছা তাই করার অধিকারী ভাবা, যেরূপ আল্লাহ্ 'কুন ফাইয়াকুন' দ্বারা করে থাকেন। কিংবা কাউকে এরূপ মৌল জ্ঞানের অধিকারী ভাবা; যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়ে দলীল-প্রমাণ, স্বপ্ন-ইল্হাম বা জ্ঞানানুশীলদের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি। রুগ্নদের রোগ মুক্তির কিংবা কাউকে অভিশপ্ত করার ক্ষমতা ও অসন্তুষ্ট হয়ে কাউকে রুগ্ন দরিদ্র কিংবা হতভাগ্য করা এবং কাহার ওপরে দয়াবান হওয়ায় তার স্বচ্ছলতা, স্বাস্থ্য ও শুভ পরিণাম দেখা দেওয়া- এ সবই আল্লাহ্র খাস গুণ। এসব গুণে অন্য কাউকে গুণান্বিত কিংবা এতেও কাহার অংশ আছে বলে ভাবা শির্ক।

এ মুশ্রিকরাও সৃষ্টির কাজে কিংবা সৃষ্টির ব্যাপারে নিয়ন্তা হিসেবে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক ভাবত না। তারা এ বিশ্বাসও রাখত যে, আল্লাহ্ যখন কিছু করতে চান, তা আটকে রাখার ক্ষমতা কারুর নেই। বরং তারা শুধু বিশেষ ব্যাপারে বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে শির্ক করত। তারা ভাবত, যেভাবে কোন

বাদশাহ্ নিজের কোন আপনজন কিংবা দরবারের কোন আমীরকে দেশের কোন এলাকার শাসনভার দিয়ে ছোট-খাট ব্যাপারে তাঁকে কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন যেন সে বাদশাহ্র অবর্তমানে নিজ মত ও সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করতে পারে, এও তেমনি ব্যাপার মাত্র।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, বাদশাহ্র পক্ষে ছোট-খাট, খুঁটি-নাটি ব্যাপারে নজর দেয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এমন সব ব্যপারে নিজ প্রেরিত ব্যক্তিদের কিংবা নিজ শাসন প্রতিভূ ও আমীরদের অধিকার দিয়ে দিতেন। তারা যেভাবে ভাল মনে করত, কাজ করে যেত। বস্তুত এভাবে তিনি সে এলাকার সব প্রজাদের সেই শাসনকর্তার কর্তৃত্বাধীনে ছেড়ে দিতেন। সেখানকার চাকর-বাকর কিংবা প্রজাদের ব্যাপারে শাসকদের সুপারিশই গ্রহণ করতেন। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ পাক ও নিজ বান্দাদের কাউকে কাউকে নিজ প্রভুত্বের খিলাফত দান করে থাকেন। সে মতে সেই বান্দাদের খুশী ও অখুশী দুয়েরই প্রভাব প্রজাদের ওপরে পড়ে থাকে। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তারা তাদের নৈকট্য লাভের ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ফলে যেন তারা মুল প্রভুর দরবারেও স্বীকৃতি লাভের উপযোগী হতে পারে। আর দাবী-দাওয়া ও প্রয়োজন মেটাবার ব্যাপারে সে সব বিশেষ বান্দাদের সুপারিশ তাঁর সকাশে মঞ্জুরী লাভের উপযোগী হয়।

এসব কারণেই তারা সে সব খাস বন্দাদের সকাশে মাথা নত করে সিজ্দা দান বৈধ ভাবত। তাদের নামে কিছু উৎসর্গ বা কুর্বাণী করা, তাদের নামে শপথ করা, বিপদে-আপদে ও বিশেষ বিশেষ কাজে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করা। এমন সব ধরনের তাদের খোদায়ী অধিকার ও ক্ষমতার তারা স্বীকৃতি দিত। এমনকি তারা সে সব বিশেষ বান্দাদের পাথর, লোহা কিংবা বিভিন্ন ধাতুর প্রতিমা বানিয়ে নিত। এ মুর্খরা ক্রমে ক্রমে এসব মূর্তিকেই প্রকৃত ইলাহ্ বলে ভাবল। তা থেকে বিরাট এক বিভ্রান্তির সূত্রপাত ঘটল।

(২) তাশ্বীহ

তাশ্বীহ অর্থ হচ্ছে, মানুষ বা তার গুণাবলীকে আল্লাহ্র সাথে সংযুক্ত করা। যেমন, তাদের বিশ্বাস ছিল, ফেরেশ্তারা আল্লাহ্র সন্তান। তাদের এ-ও বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ স্বয়ং পছন্দ না করলেও কোন কোন সময়ে পাপীদের জন্য বিশেষ বান্দাদের সুপারিশ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। যেমন, অনেক সময় মনঃপুত না হলেও বাদশাহ্ আমীর-উমরাদের সুপারিশ গ্রহণ করে থাকেন। এভাবে তারা আল্লাহ্র জ্ঞান দর্শন ইত্যাদির অসীমত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের সসীম ক্ষমতা ও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অনুরূপ ভাবত যার ফলে তারা নিরাকার আল্লাহ্র নিজেদের মত একটা আকার কল্পনা করে নিত। আর সে দেহের অবস্থিতির জন্যে স্থানও নির্দিষ্ট করে ভাবত।

(৩) তাহ্‌রীফ

তাহ্‌রীফের মূল বিশ্লেষণ হল এইঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধররা বেশ কিছুকাল ধরে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর ধর্মে স্থির ছিল। অবশেষে তাদের ভেতরে আমর ইবনে হাই মালউন জন্ম নিল। সে তাদের জন্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা গড়ে সেগুলোর পুজাকেও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে দিল। তাদের জন্যে সে ১। বাহীরা, ২। সাঈবা, ৩। হাম। কিংবা তীরের সাহায্যে লটারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করল। এ দুষ্কার্য শেষ নবী (সঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় তিনশ বছর আগে ঘটল। মুশ্‌রিকরা এ সব কাজের জন্যে বাপ-দাদার অনুসৃত কার্যের দলীল পেশ করত। সেগুলোকে তারা তাদের অন্যতম অকাট্য দলীল ভাবত।

(৪) রসূল ও পরকাল সম্পর্কে মুশরিক দল

যদিও আগেকার নবীরাও পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ গ্রহণ সম্পর্কে বলে গেছেন, কিন্তু তা শেষ নবী (সঃ)-এর মত এত বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ সহকারে বলে যান নি। এ কারণেই মুশ্‌রিকরা এ ধরনের বিশ্বাসের সাথে অপরিচিত ছিল এবং পুনরুত্থান হিসাব-নিকাশকে দুর্বোধ্য ভাবত।

এভাবে যদিও তারা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ) এমনকি হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপরেও বিশ্বাস রাখত; কিন্তু যেহেতু তাঁরাও ব্যক্তি বিশেষ ছিলেন এবং তাঁদের ব্যক্তিত্বও নবুওতের ধারাবাহিক জ্যোতির মাঝে এক-একটি ছেদ বলে মনে হত, তাই তারা দ্বিধা ও সন্দেহের মধ্যে পড়ে যেত। তারা যেহেতু এভাবে যুগে যুগে মানুষের ভেতর থেকে ভিন্ন ভিন্ন নবী পাঠাবার ভেতরে আল্লাহ্‌র হিকমতের চাহিদাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং দুত প্রেরক ও দূতের ভেতরে সামঞ্জস্য ও উপমা খুঁজতে অভ্যস্ত ছিল, তাই তারা নবুওতের সত্যিকারের ধারণা থেকে বঞ্চিত ছিল। এমনকি তারা নবীর মানুষ হওয়াটা অসম্ভব ভাবত। ফলে তারা এ ব্যাপারে অনেক আবোল-তাবোল সন্দেহ ও প্রশ্নের সৃষ্টি করত। যেমন, নবীর আবার খানা-পিনার দরকার হবে কেন? ফেরেশতাদের আল্লাহ্ কেন নবী বানালেন না? মানুষের কাছে যদি ওহী আসে তো প্রত্যেকের কাছেই তা আলাদাভাবে আসে না কেন? এভাবে আরো বহু নির্বুদ্ধিতার কথা তারা বলত। সেগুলো তাদের বিশ্বাসেরই অংশ হয়ে দাঁড়াল।

টীকা ঃ ১। যে প্রাণীর দুধ দেব-দেবীদের নামে উৎসর্গ করা হয়। ২। যে প্রাণী দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেওয়া হয়। ৩। যে উটের পিঠে সাওয়ার হওয়ার উপযুক্ত হয়েছে তাকে মুক্ত করা।

মুশ্‌রিকদের নমুনা ঃ

এর পরেও যদি মুশ্‌রিকদের প্রকৃত অবস্থা, তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কার্যাবলী সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মাতে কারো অসুবিধা থেকে থাকে সে যেন বর্তমান যুগের মুর্খ গেঁয়োদের ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। বিশেষ করে মুসলিম রাজ্যগুলোর পল্লী এলাকার মুর্খ জনসাধারণের ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপের সুস্পষ্ট ভ্রান্তিগুলো থেকেও সেকালের মুশরিকদের অবস্থা মোটামুটি অনুধাবন করা যাবে।

তারা আজ ওলীদের ব্যাপারে কিরুপ ধারণা নিয়ে চলছে। যদিও তারা অতীতের ওলীদের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তথাপি তারা এ যুগে ওলীরর আবির্ভারকে অসম্ভব মনে করে। এরা বিভিন্ন কবর ও দরগায় যায়। সেখানে তারা নানা ধরনে মুশরিকী কাজ অনুসরণ করে। লক্ষ্য করুন, তাদের ভেতরে তাশবীহ্ ও তাহ্‌রীফ কতভাবে ঠাঁই পেয়েছে। একটি সহীহ্ হাদীছে আছে– "তোমরাও অতীতের জাতিগুলোর বিভ্রান্ত কার্যধারা অনুসরণ করবে।" বস্তুত বিভ্রান্ত জাতিগুলোর খারাপ কাজ ও কুসংস্কারের একটিও এমন নেই, যা মুসলমানরা আজ অনুসরণ না করছে। আল্লাহ্ সবাইকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

মোটকথা, শুধু আরবেরই নয়, বরং গোটা দুনিয়াটারই অবস্থা এরূপ ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে আরবদের মাঝে পাঠালেন। এবং তাঁকে আবার দ্বীন-ই-ইব্‌রাহীমের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্যে নিয়োগ করলেন। সংগে সংগে কুরআন পাক সেই মুশরিকদের সাথে যুক্তির যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। আর এ যুক্তি অবতারণার ক্ষেত্রে সেগুলোই তুলে ধরল, যা ইব্‌রাহীমী ধর্মের স্বীকৃত সত্য নিদর্শনরূপে তখনও বেঁচেছিল। উদ্দেশ্য, যেন তাদের কাছে প্রামাণ্য যুক্তি হিসেবে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তারা কোনরূপে অস্বীকার করতে না পারে।

শিরকের জবাব ঃ

বস্তুত কুরআন পাকে তাদের অংশীবাদী বিশ্বাসের জবাব চারটি ধারায় দেয়া হয়েছে।

প্রথম তাদের কাছে তাদের ধ্যান-ধারণাগুলোর সমর্থনের দলীল দাবী করা হল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হল যে, তাদের এসব বিশ্বাস মূলত তাদের পূর্ব পুরুষদের বিশ্বাসের পরিপন্থী। অথচ তাদের দাবী হচ্ছে, পূর্ব-পুরুষদেরই তারা অনুসরণ করছে।

দ্বিতীয় ধারায় তাদের বুঝানো হল, যে সব বান্দাদের তারা আল্লাহ্র সাথে শরীক করছে, তাদের ও আল্লাহ্র ভেতরে কোনরূপ সমতা ও তুলনা চলে না। পরন্তু আল্লাহ্ তা'আলাই চরম মর্যাদা লাভের একমাত্র অধিকারী, কোন বান্দা নয়।

তৃতীয় ধারায় তাদের বলে দেয়া হল, অতীতের সব নবীরাও একত্ববাদের বিশ্বাসী ছিলেন। কুরআনে তা এভাবে বর্ণনা করা হল– "(হে রসূল!) আমি আপনার আগেও যে নবীদের পাঠিয়েছি, তাদের কাছে এ বাণীও পাঠিয়েছিলাম যে, আমি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নেই। তাই শুধু আমারই উপাসনা কর।ঃ

চতুর্থ ধারায় তাদের প্রতিমা পূজার অসারতা বুঝানো হল। তাদের বলা হল, যে পাথরখন্ডের তারা পূজা করছে, আসলে তা মর্যাদার বিচারে মানুষের চেয়েও অনেক নগন্য ও দুর্বল। সেক্ষেত্রে তা কি করে আল্লাহ্র মর্যাদা লাভ করতে পারে? অবশ্য এ ধারাটি শুধু সে দলের জন্যে প্রযোজ্য ছিল, যারা প্রতিমাকেই আল্লাহ্ ভেবে পূজা করত। যারা সেগুলোকে কোন এক অদেখা শক্তির প্রতিভু বলে মনে করত তাদের জন্যে নয়।

তাশবীহ্র জবাব ঃ

'তাশবীহ্ বিশ্বাসীদের তিনটি ধারায় জবাব দেয়া হল ঃ

প্রথমত, তাদের থেকেও তাদের দাবীর সমর্থনে যুক্তি ও প্রমাণ চাওয়া হল। এবং বলে দেয়া হল, তাদের এসব বিশ্বাস তাদের পূর্ব-পুরুষদের বিশ্বাসের বিরোধী। অথচ তারা জোর গলায় তাদেরই অনুসরণের দাবী করছে। আর বলছে, তারাও 'তাশবীহ' মেনে চলত।

দ্বিতীয়ত, তাদের বুঝানো হল, তাদের দলীল অনুসারে তো এটাও প্রমাণিত হয় যে, পিতা ও পুত্র একরূপই হবে। কিন্তু তাতো হচ্ছে না। তা হলে এটা কি করে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টি একই রূপ হবে?

তৃতীয়ত, তাদের এও বুঝিয়ে দেয়া হল, নিজেদের জন্য তারা যেটাকে দূষণীয় ও অপছন্দনীয় মনে করে, সেটাকে আল্লাহ্র ব্যাপারে তারা কি করে ভাল ও বৈধ মনে করে? বস্তুত তারা নিজেরা তো মেয়ে পছন্দ করে না। সেটাকে তারা লজ্জা ও বিপদ ভাবে। অথচ আল্লাহ তাআলার জন্যে মেয়ে কল্পনা করে এবং বলে যে, ফেরেশ্তারা আল্লাহ্র মেয়ে। "এটা কি করে হতে পারে যে, তোমাদের বেলায় পুত্র চাও, আর তোমাদের প্রভুর জন্যে চাও কন্যা?" (কুরআন) এ জবাব তাদের জন্যে প্রযোজ্য, যারা কাল্পনিক ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। আদতে মুশরিকদের ভেতরে 'তাহ্রীফ' কারীদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। বিভিন্ন ধারায় তাদের কার্যের জবাব দেওয়া হয়েছে।

তাহরীফের জবাব ঃ

প্রথমত, তাদের বুঝানো হল, তার যা কিছু বলছে, তার মুলে কোনই সত্যতা নেই। সবই তাদের মনগড়া। এ ধরনের কোন কথা পূণ্যাত্মাদের কোন বর্ণনায় দেখা যায় না।

দ্বিতীয়ত, তাদের বলা হল, তারা যে সব বিশ্বাস পোষণ করছে, তাও ভ্রান্ত ও অমুলক। কারণ এ সব শুধু সরর ও নির্বোধ লোকদের সৃষ্টি ও আবিস্কার। দীন-ধর্মের সাথে এ সবের কোনই যোগ নেই।

পরকালে অবিশ্বাসীদের জবাব ঃ

যারা হাশর-নশর ও মরণের পরে পুনরুত্থানকে অসম্ভব ভাবত, তাদেরও বিভিন্নভাবে বুঝানো হয়েছে। বিভিন্ন পন্থায় তাদের সন্দেহ নিরসনের প্রয়াস চলেছে।

প্রথমত, সবার আগে তাদের দুনিয়ার অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পৃথিবী শুষ্ক ও শূন্য হয়ে যাবার পরে আবার সজীবও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর এ বিবর্তন থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, জীবন ফিরে পাওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। আল্লাহ্ যেভাবে মৃত পৃথিবীকে দ্বিতীয়বার জীবিত করে থাকেন, তেমনিভাবে মৃত মানুষকে ও দ্বিতীয়বার জীবন দান করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, তাদের বলা হয়, অতীতের জাতিগুলোর এটা সর্ববাদী সম্মত বিশ্বাস ছিল যে, মরণের পরে আবার জীবন লাভ করে হিসাব-নিকাশ দানের জন্যে তাদের আল্লাহ্র দরবারে হাযির হতে হবে। আর দুনিয়ার সব ধর্ম এ ব্যাপারে একমত হওয়ায় এটা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মরণের পরে পূনর্জীবন লাভ অনস্বীকার্য সত্য।

হযরত সম্পর্কে সন্দেহের জবাব ঃ

হযরতের রিসালাত সম্পর্কে তারা নানারূপ প্রশ্ন তুলত। তাদের সব প্রশ্ন ও সন্দেহের জবাব আলাদা করে দেয়া হয়েছে।

তাদের সবচাইতে বড় প্রশ্ন ছিল এই, কোন মানুষকে কি করে আল্লাহ্ তাআলা নবী করতে পারেন? তার উত্তরে বলা হয়েছে, তাদের এ প্রশ্ন নেহাৎ ভিত্তিহীন। কারণ অতীতের সব নবীই মানুষ ছিলেন। এক আয়াত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে। "হে রসূল! আমি আপনার আগেও মানুষকেই নবী করে পাঠিয়েছি তাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। আর যারা বেঈমান, তারাই বলে যে, আপনি আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল নন। তাদের বলে দিন, তোমাদের আর আমার

ভেতরকার এ ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে স্বয়ং আল্লাহ্ ও ঐশীগ্রন্থ, পরিজ্ঞাত লোকগণই যথেষ্ট।" (কুরআন)

তাদের সন্দেহের দ্বিতীয় জবাব এরূপে দেয়া হল, কুরআনে নবুওয়াত বলতে ওহী বুঝায়। যেমন এক আয়াতে আমাদের রসূলকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, " হে রসূল! আপনি বলুন, আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। অবশ্য আমার কাছে ওহী আসে।

তারপর ওহীর ব্যাখ্যা যে ভাবে দেয়া হয়েছে, তা অসম্ভব কিছু বলে মনে হতে পারে না।

তাদের অন্যান্য প্রশ্নের জবাব মোটামুটিভাবে দেয়া হয়েছে। তাদের এটা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদের দাবী অনুসারে নবীদের মু'জিযা না দেখতে পাওয়া, তাদের পছন্দনীয় যোগ্য ব্যক্তি নবী না হওয়া, ফেরেশ্তাদের নবী না করা ও ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যেকের কাছে ওহী না পাঠানো– এ সব কিছুই বিরাট এক মংগলময় উদ্দেশ্যে হয়েছে যা তাদের মুর্খতার জন্যই বোধগম্য হয়ে উঠেনি।

জবাবের পুনরুক্তিতা ঃ

যেহেতু কুরআনের সামনে ছিল মুশরিক দল, তাই এ সমস্যাগুলো বিভিন্ন ভাবে বারংবার নতুন নতুন ভংগিতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর অত্যন্ত উচ্চাংগের আলংকারিক তাগাদার সাথে দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সেজন্য বারংবার বলতেও দ্বিধা করেনি। তাছাড়া ঠিক যে, এ ধরনের মুর্খদের বুঝাবার জন্যে অসীম বিজ্ঞ প্রভুর উপদেশের ধরন এরূপ হওয়াই দরকার-এ ধরনের অজ্ঞানদের বারংবার তাগাদা দিয়ে কথা বলেই চেতনা চাংগা করা প্রয়োজন হয়। "এটাই সর্বজ্ঞ ও সর্বজয়ী প্রভুর নিধারিত পন্থা"।

ইয়াহুদীদের অবস্থা ঃ

ইয়াহুদীরা তাওরাতে বিশ্বাসী বলে দাবী করত। তাদের বিভ্রান্তি ছিল এই, তারা তাওয়াতের বিধি-নিষেধ অদল-বদল করে ফেলেছিল। পরিবর্তন বাক্যে যেমনি ঘটিয়েছিল, তেমনি ঘটিয়েছিল অর্থেও। অনেক আয়াত তারা লোপ করে দিয়েছিল অনেক আয়াত তারা আবার নিজেদের তরফ থেকে যুক্ত করেছিল। তাছাড়া তাওরাতের বিধি-নিষেধ পালনের ব্যাপারেও তারা অবহেলা করত অনেকে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ছিল তাদের ভেতরে চরম। তারা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নবী হওয়াটাকে অসম্ভব বলে ঘোষণা করেছিল। তার সম্পর্কে তারা অনেক কুৎসা রটাত ও অশোভন আচরণ করত। পরন্তু স্বয়ং আল্লাহ তাআলার ব্যাপারেও

তারা এ ধরণেরই অশোভন মন্তব্য করত। তাছাড়া তারা কার্পণ্য লালসা, হিংসা ইত্যাদি নানা কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিল।

তাওরাতে তাহ্‌রীফ ঃ

ইয়াহুদীরা তাওরাতের শাব্দিক যে পরিবর্তন ঘটাত, তা মুল গ্রন্থে নয়, বরং ব্যাখ্যা গ্রন্থে। এ দীন লেখকের মত এটাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও এ কথা বলে গেছেন। আর অর্থগত যে পরিবর্তন ঘটাত তার স্বরূপ এই, আয়াতের যথার্থ অর্থ ছেড়ে খামখেয়ালী অর্থ করে নিত। ইয়াহুদীরা তাওরাতে যে ধরনের তাহ্‌রীফ বা পরিবর্তন ঘটাত তার একটি উদাহরণ হচ্ছে এই, যে কথাটি সাধারণভাবে বলা হয়েছে তারা সেটাকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করত। যেমন, তাদের ধর্মে ফাসিক ও দ্বীনদার, কাফির ও মুনাফিকের ভেতরকার পারস্পরিক তফাৎটুকু বলে দেয়া হয়েছে। আর এ কথা বলা হয়েছে, কাফিরদের (অবিশ্বাসী) কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং তারা চিরতরে জাহান্নামে থাকবে। অবশ্য ফাসিক (পাপী) হয়ত নবীদের শাফাআত পেয়ে মুক্তি লাভ করবে।

ধর্মানুসারীদের এ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্যে সব ধর্মেই সে ধর্মের অনুসারীদের বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাওরাতে এ মর্যাদা ইয়াহুদী ও ইব্‌রাহীমীদের ইঞ্জীলে নাসারাদের ও কুরআন মুসলমানদের দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব গ্রন্থেই এ শব্দগুলোর দ্বারা শুধু আল্লাহ্ ও পরকালে যারা বিশ্বাস করে, স্ব স্ব পয়গম্বরের অনুবর্তী হয়ে চলে, স্ব স্ব শরীয়ত মেনে চলে, ধর্মীয় বিধি-নিষেধগুলো পালন করে, তাদেরই বুঝায়। এ সব শব্দ দ্বারা কোন বিশেষ দলকে বুঝানো হয়নি। কিন্তু ইয়াহুদী দল বুঝেছে যে, জান্নাত শুধু ইয়াহুদী ও আবেরীদের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে। নবীদের শাফাআত ও শুধু তাদেরই মিলবে। জাহান্নামে তারা গেলেও অল্প সময় কাটিয়েই মুক্তি পেয়ে যাবে। তারা সত্যিকারের আল্লাহ্ ও রসূলে বিশ্বাসী হোক বা না হোক। কিন্তু তাদের এ ধারণা নির্ভেজাল মুর্খতা ও বোকামীর পরিচায়ক বৈ নয়।

কুরআন যেহেতু সব ঐশীগ্রন্থ থেকে শ্রেষ্ঠ ও মহান, আর সব গ্রন্থের চাইতে অধিক বিশ্লেষণ রয়েছে এতে, আগের গ্রন্থগুলোর সব সন্দেহ ও প্রশ্ন এখানে দুর করা হয়েছে, তাই এ ব্যাপারেও সব সন্দেহের নিরসন ঘটিয়েছে।"হাঁ, যারা পাপ করে এবং চারদিক থেকে ভ্রান্তি যাদের ঘিরে ফেলে, তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে কাটাবে।" (কুরআন)

এভাবে এটাও একটি চরম সত্য যে, সব ধর্মেই সে ধরনের বিধান নির্ধারিত হয়েছে যা সব যুগের দাবী মেটাবার জন্যে যথেষ্ট ছিল। বিভিন্ন ব্যাপারে বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে বিশেষ যুগের বা সম্প্রদায়ের স্বভাব-প্রকৃতি লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। যাদের জন্যে বিধান বা আইন-কানুন, তাদের অবস্থানুসারেই ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। সে বিধান ও আইন-কানুনকে সত্য সঠিক জানার জন্যে তাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এখানে মুল উদ্দেশ্য ছিল এই, এ সব বিধি-বিধান যেখানে যাদের জন্যে রচিত হয়েছিল, এর সত্যতাও সে যুগের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তা চিরস্থায়ী বিধান ছিল না। শুধু সেকালের উম্মতদের জন্যেই তা কার্যকরী ছিল। অর্থাৎ অন্য নবী না আসা পর্যন্ত পূর্ববর্তী নবীর যুগ চলত। অবশ্য কোন ধর্মেরই মোলসত্ত্বায় কোন তফাৎ থাকে না। অথচ ইয়াহুদীরা এর অর্থ বুঝল অন্যরূপ। তারা ভাবল, ইয়াহুদী ধর্ম ও তার বিধি-বিধান কখনই বাতিল হতে পারে না। অথচ মূল অবস্থা হল এই, যখন কোন ধর্মকে অনুসরণ করতে বলা হয়, তা দ্বারা সেই খাস ধর্মের অনুসরণ মাত্র বুঝায় না; বরং তা দ্বারা ঈমান ও নেক আমল বুঝায়। কিন্তু ইয়াহুদীরা ধর্মের নির্দিষ্টতায় বিশ্বাসী হল এবং বুঝে নিল, হযরত ইয়াকুব (আঃ) শুধু ইয়াহুদী ধর্ম অনুসরণের কথাই বলে গেছেন।

এতো গেল ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থের মতলরবিকৃতি ঘটানোর পরিচয়। তারা আয়াতের কোন কোন শব্দ ও পরিভাষায়ও তাহ্রীফ সৃষ্টি করেছিল। যেমন, আল্লাহ তাআলা সব ধর্মেই নবী ও তাঁর অনুসারীদের আপন ও প্রিয়জন বলে সম্বোধন করেছেন। পক্ষান্তরে ধর্ম অস্বীকারকারীদের অভিশপ্ত ও অপছন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। এ ব্যাপারে সে সব শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে যা সেই সম্প্রদায়ের ভেতর দৈনন্দিন জীবনের পরিভাষা হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সুতরাং কোথাও যদি 'বন্ধু' না বলে 'বৎস' শব্দ ব্যবহার করে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

কিন্তু ইয়াহুদীরা এ সত্য এড়িয়ে গেল। তারা বুঝে নিল, নৈকট্য ও বন্ধুত্বের মর্যাদা কেবল ইয়াহুদী, আবেরী ও ইসরাঈলীদের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে। তারা এটা বুঝতে পারলো না যে, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও তাঁর বিধি মেনে নেয়াই সে মর্যাদা লাভের রক্ষা- কবচ।

এভাবে আরও অনেক ভ্রান্তিপূর্ণ অসার ব্যাখ্যা তাদের মনে বাসা বেঁধে ছিল। সেগুলো তারা তাদের বাপ-দাদা থেকে শিখেছে ও উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছে। কিন্তু কুরআন সে সব ভুল ধারণার পূর্ণ অবসান ঘটিয়েছে।

কিতমানুল- আয়াত (বাক্য বিলোপ)

কিতমানে আয়াত বলতে তাদের মর্যী ও স্বার্থের বিরোধী আয়াতগুলোকে তাওরাত থেকে গোপন করে ফেলাকে বুঝায়। এর উদ্দেশ্যে ছিল, তাদের আবহমান কাল থেকে পেয়ে আসা মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখা। সাধারণ লোক ধর্মনেতাদের ওপরে আস্থা রাখত। এ আস্থা যাতে কমে না যায় ও ধর্মগ্রন্থ তারা মানছে না– এটা যেন কেউ না বুঝে ফেলে, এ জন্যে তারা সেরূপ করত। এর কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেয়া হল ঃ

১। তাওরাতে যিনাকারের জন্যে পাথর মেরে উড়িয়ে দেবার বিধান রয়েছে। কিন্তু, ইয়াহুদী ধর্মনেতাদের সর্বসম্মত মতে সে বিধান বদলে গেল। তার বদলে তারা কোড়া মারা ও মুখে কালি মাখার বিধান তৈরী করল। অথচ সর্বসাধারণ যদি এ পরিবর্তনের খবর পেত, তাদের ওপরে আস্থা হারিয়ে ফেলত। তাই কোনরূপ অবমাননার ভয়ে তারা শেষ পর্যন্ত পাথর মারার সে আয়াতই গোপন করে ফেলল।

২। তাওরাতে এমন কিছু আয়াতও ছিল যাতে হযরত হাযিরা (রাঃ) হযরত ঈসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরদের জন্যেও নবুওত প্রাপ্তির সুসংবাদ ছিল। সে সব আয়াতে এমন জাতির খবরও দেয়া হয়েছিল, যারা আরবে কর্তৃত্ব লাভ করবে। আরাফাতের পাহাড়গুলো তাদের বদৌলতে 'লাব্বায়েক' গুঞ্জনে মুখর হবে। সব দেশের লোক হজ্জ ও যিয়ারতের জন্যে সেখানে আসতে থাকবে।

ইয়াহুদীরা পয়লা তো সেগুলোর ব্যাখ্যা বিকৃত করার প্রয়াস পেল। তারা বলল, এ সব আয়াতে নয়া একটা সম্প্রদায়ের খবর দেয়া হয়েছে মাত্র। তাদের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা বলা হয়নি। অবশ্য এ কথা তাদের ভেতরে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। "মালহামাতুন কুতিবাত আলায়না" অর্থাৎ ইহা একটি যুদ্ধ যা আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। আমাদের ওপরে মুসলিমদের যে প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা তাওরাতের লিখিত ইয়াহুদীদের ওপরে কাফিরদের প্রাধান্য লাভের বাস্তবায়ন বটে। কিন্তু যখন তারা দেখল, তাদের এ ব্যাখ্যায় কেউ নিরস্ত হচ্ছে না, তখন সে আয়াতকেই লুকিয়ে ফেলা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। তাই একে অপরকে এ আয়াত গোপন করার পরামর্শ দিয়ে চলল। তারপর সবাই এ সিদ্ধান্ত নিল যে, সর্বসাধরণ্যে এ আয়াত প্রকাশ করা হবে না। 'আল্লাহ্র সকাশে দলীল পেশ করার জন্যে তোমরা কি আল্লাহ্র উদঘাটিত সত্যের বিরুদ্ধে কথা তৈরী করে নিচ্ছ।"

কত বড় মূর্খতা! আল্লাহ্ তাআলার এত জোরের সাথে হযরত হাযিরা (রাঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে নবী আবির্ভাবের ও নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভবের খবর দান শুধু খবরের খাতিরেই, আনুগত্য বা অনুসরণের জন্যে নয়, এটা কি করে বুঝল? আদতে এ তো বোকামী ছিল না, ছিল বাড়াবাড়ি ও আল্লাহ্র নামে মিথ্যার বেসাতি চালানোর বিরাট কারসাজী।

ইফ্তিরার স্বরূপ ঃ

নিজের মনগড়া কথাকে আল্লাহ্র নামে চালানোই ইফ্তিরা। এর কারণ ছিল এই, ইয়াহুদী আলেম ও ধর্মনায়কদের ভেতরে বিশেষ এক ধরনের বাড়াবাড়ি ঠাঁই পেয়েছিল তারা ইস্তিহ্সান অর্থাৎ কল্যাণপ্রসু ভেবে ধর্ম গ্রন্থে না থাকা সত্ত্বেও কিছু বিধি-বিধান নিজেরা তৈরী করে নিল। সে মনগড়া বিধানকে তারা ঐশী-গ্রন্থের বিধানের মতই মেনে চলা অপরিহার্য ভাবত। তা ছাড়া তারা ধর্মনায়কদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে ধর্মীয় বিধানের মতই অকাট্য দলীল বলে ভাবত। হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওত ও রিসালত অস্বীকার করার জন্যে তাদের কাছে স্বীয় ধর্মনেতাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কোন দলীলই ছিল না। আরও অনেক বিধান সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে।

মুসাহালার স্বরূপ ঃ

ধর্মীয় বিধানকে হাল্কা করে দেখা ও সে ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে চলাকে 'মুসাহালা' বলা হয়। তারা তাওরাতের বিধান সম্পর্কে এরূপ নীতিই অনুসরণ করত এবং কার্পণ্য ও লালসার মত নিকৃষ্ট চরিত্রে তারা নিমজ্জিত ছিল। বলা বাহুল্য, এসব কু-প্রবৃত্তির কারসাজী বৈ কিছুই ছিল না। কু-প্রবৃত্তি সবাইকে প্রভাবিত করে এবং সর্বদা খারাপ কাজে উস্কানি দেয়। তার দৌরাত্ম থেকে আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেন, সেই কেবল বাঁচতে পারে।

স্বেচ্ছাচার ও রিপুর লীলা খেলা সেই ঐশীগ্রন্থ প্রাপ্তদের ভেতরে সম্পূর্ণ এক নতুন মনোভাবের জন্ম দিল। তারই আশ্রয় নিয়ে তারা আয়াতের অপব্যাখ্যা ও মনগড়া বিধানকে ধর্মীয় বিধানের মর্যাদা দিয়ে চালু করে দিল।

শেষ নবীর ব্যাপারে তাদের সন্দেহের স্বরূপ ঃ

শেষ নবী (সঃ)-এর ব্যাপারে তাদের সামনে যে সব সন্দেহ ও সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তার কারণ নিম্নে দেয়া হল–

১। নবীদের স্ত্রীর সংখ্যা একরূপ ছিল না। এ ধরনের ব্যক্তিগত কার্যকলাপ ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে নবীদের স্বাতন্ত্র্য ও অনৈক্য দেখা যায়।

২। নবীদের শরীয়াত ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে বেশ কিছু পৃথক মনে হয়। খুঁটিনাটি বিধি-বিধানের ব্যাপারে পরস্পরের ভেতর কমই ঐক্য দেখা যায়।

৩। বিভিন্ন নবীদের বেলায় আল্লাহ্ তাআলার পন্থা ও কার্যধারা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যার ফলে নবীদের বাহ্যিক অবস্থা এক ধরনের ছিল না।

৪। এ পর্যন্ত যত নবী এসেছিলেন, অধিকাংশই ইসরাঈল গোত্রের ছিলেন। শুধু হযরত (সঃ)-ই ছিলেন ইসমাঈল (আঃ)-এর গোত্রের।

একে তো অভ্যাস, কার্যধারা ও শরীয়তের ব্যাপারে পার্থক্য, তার ওপরে ইসমাইল বংশের হওয়ায় আমাদের রাসূল (সঃ)-এর ওপরে ইয়াহুদীগণ আস্থা আনতে পারল না। তাঁর নবূওত সম্পর্কে তাদের মনে নানা সংশয় দেখা দিল।

রসূলের দায়িত্বের সীমা রেখা ঃ

অথচ ইয়াহুদীরা যে সব ব্যাপারে প্রভাবিত হল, নবূওতের সাথে তার কোনই যোগ নেই। কারণ রসূলের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু মানুষের আত্মাকে কলুষমুক্ত করা এবং তাদের উপাসনা ও অভ্যাস সঠিক করে দেয়া। পাপ-পূণ্যের বিধান তৈরী করা রসূলের দায়িত্ব নয়। রীতি-নীতি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আলাদা থাকে। নবী কোন এক সম্প্রদায়ের ভেতরে আসেন। তিনি এসে তাদের রীতি নীতি তুলে দিয়ে নতুন সামাজিক রীতি-নীতি প্রবর্ত্তন করেন না; বরং তিনি সেগুলোর ভাল মন্দ বিবেচনা করেন। যেগুলো কল্যাণকর ও আল্লাহ্র অভিপ্রেত মনে করেন, সেগুলোতে হাত দেন না। অন্যান্য গুলোও প্রয়োজনীয় সংশোধন সহকারে রেখে দেন। সুতরাং সামাজিক রীতি-নীতির এ পার্থক্যের সাথে নবূওতের তেমন যোগ থাকে না।

নবীদের শরীয়াতের যে অংশ তায্কীর বি আলাইল্লাহ্ ও তায্কীর বিআইয়্যামিল্লার সাথে যোগ রাখে, তাও স্থানীয় প্রচলিত ও পরিচিত ব্যবস্থার সাথে যোগ রেখেই হয়ে থাকে। এ কারণেই নবীদের শরীয়তের বাহ্যিক তারতম্য দেখা দেয়। (স্থান, কাল ও পাত্রের তারতম্যের দরুন বহিরাবরণে এ তারতম্য দেখা দিতে বাধ্য। তবে শরীয়াতের মূল কথা সবই এক।)

শরীয়াতে তারতম্যের মূলকথা ঃ

এ তারতম্য হল ঠিক দুটো রোগীর বেলায় বিজ্ঞ ডাক্তার যেরূপ দুধরনের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন, তেমনি। একজনকে দেন তিনি ঠান্ডা ঔষধ, ঠান্ডা পথ্য।

অথচ আরেকজনকে দেন গরম দাওয়াই, গরম পথ্য। কিন্তু এ উভয় অবস্থায়ই ডাক্তারের উদ্দেশ্য একই থাকে। তা হচ্ছে রোগ দূর করা ও রোগীকে নিরাময় করা। এছাড়া তো আর কিছুই নয়। এটা সম্ভব যে, বিজ্ঞ ডাক্তার ভিন্ন ভিন্ন দেশে সে দেশের প্রকৃতি ও আবহাওয়া অনুসারে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করবেন। তেমনি মওসুম ও প্রকৃতি বদলের সাথে সাথে তিনি দাওয়াইও বদলে দেবেন। ঠিক তেমনি মূল ডাক্তার অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা যখন চাইলেন যে, মানুষের আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা করবেন, তাদের মন মেজাজ ভাল করে দেবেন, আত্মাকে শক্তিশালী ও সুস্থ করে তুলবেন, তখন স্বভাবতই তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি ও অভ্যাস অনুসারে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা দান করেছেন।

ইয়াহুদী আলেমদের নমুনা ঃ

এ যুগে যদি আপনারা ইয়াহুদী আলেমদের নমুনা দেখতে চান, তা হলে নিজেদের সে সব আলেমের দিকে লক্ষ্য করুন যারা পার্থিব স্বার্থের দাস হয়ে ভুল পথে ভ্রান্ত কাজ অনুসরণ করে চলছে। এরাও নিজ রাসূলের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে চলছে। তারা কতিপয় পূর্ববর্তী আলেমের মনগড়া ফতোয়া মেনে চলেছে। আর পবিত্র শরীয়াত স্রষ্টা প্রভুর পুণ্য বাণীর ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে। তারা মনগড়া হাদীস আর অপব্যাখ্যাকে নিজেদের পথ প্রদর্শক ইমাম নিযুক্ত করেছে।

ঈসায়ীদের ধর্ম বিশ্বাস ঃ

তারা হযরত ঈসা (আঃ) এর রিসালাতের ওপরে ঈমান রাখত। কিন্তু তাদের বিভ্রান্তি ছিল এই, তারা আল্লাহ্ পাককে এমন তিন সত্তার সমন্বয় ভাবত, যারা বিভিন্ন দিক থেকে পরস্পর বিরোধী ছিল। অবশ্য কোন কোন ব্যাপারে তিনের ভিতরে ঐক্যও বিদ্যমান ছিল। তারা এ তিন সত্তার নাম দিল "আকানীমে ছালাছা"। এ তিন আকানীমের একটি হচ্ছে 'পিতৃ' রূপ। নিখিল সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে এ সত্তা বিরাজ করছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, 'পুত্র' রূপ। সৃষ্টির প্রথম সত্তা সেটি। তাই সৃষ্টিরই অন্যতম। তৃতীয়টি হচ্ছে 'রূহুল কুদুস' অর্থাৎ জ্ঞান বা বোধি সত্তা।

ঈসায়ীদের বিশ্বাস ছিল, হযরত মসিহ 'পুত্র' রূপ ধারণ করে ধরায় এলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যেভাবে মানুষের রূপ ধরে দুনিয়ায় আসেন, তেমনি তিন সত্তাই হযরত ঈসা (আঃ)-এর রূপ ধরে প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত হযরত ঈসা (আঃ)-ই আল্লাহ্, আল্লাহ্র পুত্র এবং মানুষও। তাঁর ভেতরে ঐশ্বরিক ও মানবিক দুটি গুণই বর্তমান। তারা তাদের এ দাবীর সমর্থনে ইয়াহুদীদের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করে থাকে। কারণ সে সব আয়াতে তাঁকে 'পুত্র' বলা হয়েছে এবং তিনি এমন সব কাজ নিজেই করেছেন বলে জাহির করেছেন, যেগুলো কেবল আল্লাহ্র জন্যেই নির্দিষ্ট।

জবাব ঃ

প্রথম, যদি আমরা বর্তমান ইঞ্জীলকে যথাযথ ও অপরিবর্তনীয় বলে মেনে নেই, তথাপি তাতে যে 'বৎস' সম্বোধন রয়েছে, তাতে আল্লাহ্র সোজাসুজি পুত্র বলে প্রমাণিত হয় না। কারণ প্রাচীনকালে প্রিয় আপনজনকে 'বৎস' বলে সম্বোধন করার প্রচলন ছিল। সুতরাং এখানেও 'বৎস' বলিতে তাই বুঝানো হয়েছে। ইয়াহুদীদের অন্যান্য আয়াতে এই ইঙ্গিত মেলে।

দ্বিতীয়ত, (তিনিও ঐশ্বরিক নিজেই কর্তা হওয়ায় বুঝা যায়, তিনিও ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী ও আল্লাহ্র পুত্র) হযরত ঈসা (আঃ) যে সব ঐশ্বরিক কাজের নিজেকে কর্তা বলেছেন, তা মূল ঘটনার বর্ণনা বৈ নয়। যেমন, কোন রাজদূত এসে খবর দেয়, "আমরা অমুক দেশ জয় করেছি আর অমুক কিল্লার প্রতিটি ইট খসিয়ে ফেলেছি।" আদতে এ সব কাজের মূল কর্তা হলেন রাজা এবং দূতের ক্ষমতা মুখপাত্রের ক্ষমতা মাত্র।

তাছাড়া এও হতে পারে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে ওহী নাযিলের ধারা এরূপ ছিল যে, ঐশ্বরিক সব সত্য ও সংবিধান তাঁরই ভেতরে আত্মপ্রকাশ করত। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) মানুষরূপে আর ওহী নিয়ে আসতেন না। সুতরাং ওহী ধারণের সাথে সাথে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কথাবার্তার ধরন বদলে যেত। তিনি আল্লাহ্র হয়েই সব কথা বলতেন। আল্লাহর কাজকে নিজের কাজ বলেই প্রকাশ করতেন। এটা তো অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট ব্যাপার।

কুরআনের মীমাংসা ঃ

মোটকথা, কুরআন এসে ঈসায়ীদের এসব ভ্রান্ত ধারণার পূর্ণ নিরসন ঘটালো। কুরআন বলল, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র খাস বান্দা ও তাঁর আত্মা

মাত্র। তাঁকে আল্লাহ্ হযরত মরিয়ম (রাঃ)-এর উদরে ঠাঁই দিলেন। আর রূহুল কুদুস্ অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তার আবির্ভাব সহায়তা করলেন। এছাড়া আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

যদি ধরা হয়, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এরূপ এক আত্মারূপ ধারণ করেছিলেন, যা মূলত অন্য আত্মা থেকে পৃথক ছিল না আদৌ, এবং আমাদের সামনে তিনিই মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তা হলে সামান্য চিন্তা করলেই পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয় যে, তা নিতান্তই বাস্তব পরিপন্থী ব্যাপার। কারণ, সে অবস্থায় বান্দা আর মাবুদের সম্পর্ক স্থাপন করা চলে না। এ দুয়ের জন্যে 'এক' শব্দ ব্যবহার করা চলে না। বরং সে সত্যটিকে 'তাকভীম' (প্রতিষ্ঠা) বা অনুরূপ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করতে হয়। আর আল্লাহ্‌র শানে তা এমন অবমাননাকর ব্যাপার, যা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে রয়েছেন।

ঈসায়ীদের নমুনা ঃ

যদি আপনারা এ সম্প্রদায়ের সঠিক নমুনা দেখতে চান, তা হলে অতীতের পূণ্যাত্মা ও আওলিয়াদের বংশধরদের দিকে লক্ষ্য করুন। দেখুন, তারা তাদের বাপ দাদাদের কত রকমের খেতাব দিয়ে রেখেছে। সত্য বলতে কি, প্রকাশ্যে তো তাদের আল্লাহ্ বলছে না। কিন্তু তাদের যে সব গুণাবলী ও ক্ষমতার দাবী তারা করে, তাতে কোন অংশেই তাদের আল্লাহ্ থেকে ছোট হতে দেয় না। শীঘ্রই এ জালিমরা কর্মফলে ভুগবে।

ইসায়ীদের এও একটা ভ্রান্ত ধারণা যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে শুলি দেয়া হয়েছিল। অথচ এখানে তারা একটা ভ্রমের শিকার হয়েছিল এবং ঈসা (আঃ)-কে আকাশে তুলে নেয়ার ব্যাপারটিকে তারা হত্যা ভেবেছিল। যুগ যুগ ধরে তারা এ ভুলটি পোষণ করে আসছিল। কুরআন এসে তাদের এ ভুলটি ভেংগে দিল এবং জানিয়ে দিল, "ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেনি, শুলেও দেয়নি; বরং এ ব্যাপারে তারা ভ্রমে পড়েছিল।"

আরেকটি ভ্রান্তির অপনোদন ঃ

ইঞ্জীলে হযরত ঈসা (আঃ) কে শূলিতে চড়ানোর ব্যাপারে যে কথা স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) এর নামে চালানো হয়, তার অর্থ এ নয় যে, সত্যিই তিনি নিহত হয়েছিলেন। বরং তা থেকে ইয়াহুদীদের এ নীচতার কথাই বুঝানো হয়েছে যে, তারা তাঁকে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করতে গিয়েছিল এটা স্বতন্ত্র কথা যে, আল্লাহ্ তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ঈসা (আঃ)-এর সহচর হাওয়ারীনদের যে বাণীর উধৃতি দেয়া হয়, তার ভিত্তিও সন্দেহ ও ভ্রান্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। আদতে কাউকে জীবিত অবস্থায় আকাশে তুলে নেয়া যায়, এটা বুঝবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। কারণ এ ব্যাপারে আগে তারা কখনও দেখেনি শোনেওনি। তাই এর কল্পনাও তারা করতে পারত না। তারা এ জন্যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশে উঠে যাওয়ার ব্যাপারটিকে হত্যাই ধরে নিয়েছিল।

ইঞ্জিলে যে ফারকালীতে আগমনজনিত সুসংবাদ রয়েছে, সে সম্পর্কেও ঈসায়ীরা ভ্রান্তির শিকার সেজেছে। তাদের বিশ্বাস এই, প্রতিশ্রুত ফারকালীত মূলত হযরত ঈসা (আঃ)। নিহত হবার পরে তিনিই আবার হাওয়ারীনদের সাথে দেখা করার জন্যে ফিরে এসেছিলেন এবং তাদের পবিত্র ইঞ্জিলের অনুসারী থাকতে বলে গেছেন। তারা এও বলে, হযরত ঈসা (আঃ) ওসীয়ত করে গেছেন, 'আমার পরে অনেক ভন্ড নবী আসবে। তাই যে ব্যক্তি এসে আমার কথা বলবে, তার কথা মেনে নিও আর যে আমার নামে তোমাদের ডাকবে না, তাকে আমল দিবে না।'

কুরআন মজীদ পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যক্তিটি হলেন আমাদেরই রাসূল (সঃ)। কিছুতেই তাতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আত্মিক কিংবা দৈহিক পুনরাবির্ভাব বুঝায় না। কারণ ইঞ্জিলেও বলা হয়েছে, প্রতিশ্রুত ফারকালীত কিছুকাল তোমাদের মাঝে থাকবেন এবং বিভিন্নরূপ শিক্ষা দান করবেন। মানুষের আত্মা ও চরিত্র সংশোধন করবেন। ভবিষ্যদ্বাণীতে যে বলা হয়েছে, তিনি এসে হযরত ঈসা (আঃ) এর নাম বলবেন, তার অর্থ এই যে, যে নবী আসবেন, তিনিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবূওতের সত্যতা মেনে নিবেন। তার অর্থ এ নয় যে, ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ কিংবা তাঁর পুত্র স্বীকার করবেন।

মুনাফিক ও তাদের মৌলিক বিশ্বাস ঃ

যারা মুখে ইসলাম বলে অথচ মূলত মুসলমান নয়, তাদের বলা হয় মুনাফিক। তারা দু ধরনের। তাদের একদল ছিল, যারা মুখে ইসলামের কলেমা পাঠ করত, কিন্তু মনে প্রাণে ছিল কাফির। অন্তরে তাদের যা ছিল, মুখে ঠিক তার বিপরীত বলত। তাদের সম্পর্কে কুরআন খবর দিয়েছে, 'তারা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে ঠাঁই পাবে।'

কাজে মুনাফিক ঃ

তাদের দ্বিতীয় দলটি বড়ই দুর্বল প্রকৃতি নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এরা মূলত বিশ্বাস ও অভ্যাসে নিজ সম্প্রদায়ের অনুগত ছিল। যখন গোটা সম্প্রদায় মুসলমান হল, তারাও মুসলমান হয়ে গেল। যদি তাদের সম্প্রদায় কাফির থাকত, তারাও তাই থাকত।

এ দলের ভেতর তারাও শামিল ছিল, যারা দুনিয়ার সাধারণ সুখ সম্ভোগে ডুবে থাকাকে শ্রেয় ভাবত। দুনিয়ার মোহ তাদের এমন করে পেয়ে বসেছিল যে, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের ভালবাসা কখনও তাদের অন্তরে ঠাঁই খুঁজে পেত না।

এ দলের ভেতর এমন লোকও ছিল, যাদের অন্তরে লোভ– লালসা, হিংসাদ্বেষ এরূপভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, তার ইবাদত ও মুনাজাত থেকে আনন্দ আহরণের ক্ষমতাই হারিয়ে বসেছিল। আল্লাহ্ ও তাদের ভিতরে তাই কোন সম্পর্কই গড়ে উঠতে পারেনি।

মুনাফিকদের ভেতর এরূপ ও একদল ছিল, যারা পার্থিব ব্যাপারে নিজকে সর্বতোভাবে ডুবিয়ে রাখত। উপার্জন ও জীবিকা নিয়েই ব্যস্ত থাকত। ফলে, পরকালের প্রস্তুতি নিয়ে ভাববার তাদের অবকাশই মিলত না। যার ফলে মৌলিক বিশ্বাসের ব্যাপারে যথা, রাসূল (সঃ) সম্পর্কে ও তাদের ভেতরে নানা জল্পনা-কল্পনা ও সন্দেহ ঠাঁই নিত। কিন্তু তা এতদুর যেত না যে, ইসলাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ করত।

মুনাফিকদের সন্দেহের কারণঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নবূওতের ব্যাপারে মুনাফিকদের সন্দেহের কয়েকটি কারণ ছিল। সবচাইতে বড় কারণ ছিল, রাসূলও মানুষ ছিলেন। মানুষের মতই তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন ও কার্যাদি ছিল। তাই সাধারণ মানুষ থেকে তাঁকে পৃথক করে দেখা তাদের জন্যে কঠিন ছিল। তেমনি ইসলাম প্রচার, প্রসার ও ইসলামী রাজ্যের বিস্তার তাদের কাছে অন্যান্য রাজার রাজ্য বিস্তারের মতই মনে হত। তাই তারা এক রাসূলের শাসনক্ষমতা লাভ ও রাজ্য বিস্তারের সংগে এক বাদশাহ্র সিংহাসন লাভ ও রাজ্য বিস্তারের কোন পার্থক্য বুঝতে পারত না। রাসূল বলতে তারা বাদশাহ্র মতই একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি ভাবত। তাই নবূওতের ওপরে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হবার বদলে সন্দেহই বেড়ে চলত।

মুনাফিকদের ভেতরে একদল এরূপ ছিল যে, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের কাফির আত্মীয় স্বজনদের মায়া ছাড়তে পারেনি। তাদের এ মায়া আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করতে বাধ্য করত এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল করে দিত। তারা এ কাজে ইসলামের কতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি হচ্ছে সে পরোয়া আদৌ করত না। পরন্তু তারা নিজ গোত্র ও আপনজনদের সাহায্য করতে গিয়ে জেনে শুনেই ইসলামের ক্ষতি সাধন করতে পিছপা হত না।

এ হিসেবে নেফাকী দু ধরনের ধরা যায়। প্রথম, মৌলিক বিশ্বাসে মুনাফিক, দ্বিতীয়, কার্যকলাপে মুনাফিক। রাসূলে (সঃ)-এর পরে মৌলিক বিশ্বাসে মুনাফিকদের চিনে বের করা মুশ্‌কিল। কারণ বিশ্বাসের ব্যাপারটি অদৃশ্য। অন্তরের খবর রাখা সম্ভবপর নয়। অবশ্য কার্যকলাপে মুনাফিকী সাধারণ ও ব্যাপক হয়ে ধরা দেয়। তাই খুব সহজেই সেটা চেনা যায়। আমাদের যুগে বিশেষত এ ধরনের মুনাফিক অসংখ্যা।

রাসূল (সঃ) এক হাদীসে মূলত এ ধরনের মুনাফিকদের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "তিনটি ব্যাপার এমন রয়েছে তা যাদের ভেতরে পাওয়া যাবে, তারা নিশ্চয়ই মুনাফিক। একটি হচ্ছে, কথা বললে মিথ্যা বলবে। দ্বিতীয়, ওয়াদা করলে খেলাফ করবে। তৃতীয়, তর্ক করলে গালিগালাজ নেমে যাবে। এরা বাহ্যত মুসলমান হলেও আসলে মুনাফিক।" এই মর্মে আরও অনেক হাদীস রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন পাকে মুনাফিকদের চরিত্র ও কার্যকলাপের স্বরূপ তুলে ধরেছেন এবং মুফাফিকদের এ দু দল সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। বান্দারা যেন তাদের খবর রাখে এবং তাদের থেকে বেঁচে থাকে।

মুনাফিকের নমুনা ঃ

এ যুগে যদি আপনি মুনাফিকের নমুনা দেখতে চান, তাহলে নেতা ও রাষ্ট্র নেতাদের মজলিসে যান। তাদের মোসাহেবদের তামাশা দেখুন। তারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির ওপরে নেতার সন্তুষ্টিকে স্থান দিতে ব্যস্ত থাকে। সত্য কথা তো এই, এ যুগে যারা আল্লাহ্র রাসূলের সব কথা জেনে শুনে মুনাফেকী করে এবং সে যুগে যারা হযরত (সঃ)-এর ইচ্ছা অনিচ্ছা ও হুকুম-আহ্কাম সরাসরি লাভ করে মুনাফিক হয়েছিল, এই দু দলের ভেতরে আদৌ পার্থক্য নেই।

এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের একটা দল রয়েছে যাদের অন্তরে নানারূপ অসংখ্য সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে এবং পরকাল কে ভুলে রয়েছে। তারাও মুনাফিক থেকে কম নয়।

আমাদের কর্তব্য ঃ

মুনাফিকদের এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে এই, যখনই কুরআন পাঠ করতে বসবেন তখন কিছুতেই এ কথা ভাববেন না যে, এসব বিশেষ কালের কোন এক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল এবং এখন তাদের বিলোপ ঘটেছে। আল্লাহ্র রাসূলের এ হাদীস সামনে রাখবেন, "তোমারও অতীতের জাতিগুলোকে অনুসরণ করে চলবে।" নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন, পৃথিবীতে আজ এমন কোন অনাসৃষ্টি নেই, যার নমুনা আগে অবর্তমান ছিল। সুতারং কাল যে কথা বলা হয়েছিল, তার সত্যতা আজও যথাযথ ভাবে বিদ্যমান রয়েছে। তাই কুরআনের আসল উদ্দেশ্য হল, দুর্ঘটনার মৌলিক কারন বলে দেয়া। তা না হলে বর্ণনার বারংবার পুনরাবৃত্তির কোনই সার্থকতা নেই।

সে যা হোক, ওপরে চারটি বিভ্রান্ত দল যথাঃ মুশরিক, ইয়াহুদী ঈসায়ী ও মুনাফিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান ও তাদের বিশ্বাসগুলোর যথাসম্ভব জবাব দান করা হল। এর ফলে ইনৃশাআল্লাহ্ 'মুখাসামার আয়াতগুলি বুঝতে খুবই সুবিধা হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চ ইলমের পরিশিষ্ট

তায্‌কীর বি আলাইল্লাহ ঃ

জেনে রাখা প্রয়োজন, কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে গোটা মানব জাতির সভ্যতা ও আত্মিক পবিত্রতা সৃষ্টির জন্যে। সে ক্ষেত্রে আরব-অনারব কিংবা শহুরে বা গেঁয়োর প্রশ্ন নেই। সুতরাং ঐশী-কৌশলের চাহিদা এটাই ছিল যে, আল্লাহ্‌র নিদর্শন স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে শুধু সে সব ব্যাপারে আলোচনা করা হবে যা অধিকাংশ লোকের জানা থাকে। তাই 'আলাইল্লাহ্‌র' আলোচনার ধারায় অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার ব্যাপারটি নির্দিষ্ট গন্ডিতে সীমিত রাখা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলীর এমন বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা সাধারণ বুদ্ধির মানুষও সহজে অনুধাবন করতে পারে। সে জন্যে যেন 'ইলমে কালাম' কিংবা খোদায়ী কলাকৌশলের তত্ত্ব অধ্যয়নের প্রয়োজন দেখা না দেয়।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ঃ

বস্তুত কুরআন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করেছে। প্রমাণের জন্যে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস নেই তাতে। কারণ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ধারণাটি মানুষের ভেতরে ব্যাপক হয়ে আছে। পৃথিবীর ভেতরে এমন কোন সুস্থ ও স্বাভাবিক দেশ বা জাতি নেই, যেখানে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়।

অবশ্য আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রশ্নটি চিন্তা ভাবনা ও সাধনা ব্যতিরেকে সহজে বুঝে ফেলার নয়। সত্য বলতে কি, তার তত্ত্ববুঝ ও বুঝানো উভয়ই অসম্ভব। কিন্তু সব চাইতে মুশকিলের ব্যাপার হল এই, যদি আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে কোনই ধারণা না নেয়া যায়, তাহলে পরিচয় লাভও সম্ভবপর নয়। অথচ সভ্যতা ও আত্মিক মার্জনা সৃষ্টির জন্যে সেই পরিচয়ই একমাত্র পথ। তাই আল্লাহ্‌র অপার লীলা সেই কঠিন পথটির এভাবে সমাধান ঘটিয়েছে যে, মানুষের গুণাবলীর ভেতরে এমন কতগুলো গুণ বেছে নিয়েছে যেগুলো সব মানুষেরই জানা আছে। সেই গুণগুলোকে খোদার সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য গুণাবলীর স্থলে এমনভাবে পেশ করা হয়েছে, যাতে করে অক্ষম মানুষ সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিতে পারে। অথচ সংগে সংগে বলে দেওয়া হয়েছে, "এসবের কোন তুলনা নেই।"

কারণ সীমাবদ্ধ গুণের মানুষ যেন আল্লাহ্‌র গুণকে অনুরূপ ভাবতে গিয়ে ভুল ধারণা ও মুর্খতার শিকারে পরিণত না হয়।

এমন কতগুলো মানবীয় গুণও রয়েছে, তা যে শুধু আল্লাহ্‌র মর্যাদার অনুপযোগী তাই নয়; উপরন্তু সে সব যদি আল্লাহ্‌র সাথে সংযুক্ত করা হয় তা হলে মানুষ ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের শিকার হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, সন্তান জন্ম নেয়া, কান্নাকাটি করা, শোকে অধীর হওয়া ইত্যাদি। তাই এসব মানবীয় গুণকে আল্লাহ্‌র সাথে সংযুক্ত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য যে সব গুণের সংযোজন মৌল বিশ্বাসে বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি না ঘটায়, আর যে সব গুণের সংযোজন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে, এ দুয়ের ভেতর পার্থক্য সৃষ্টি করা এমন সূক্ষ্ম ও কঠিন ব্যাপার, যেখানে মানবীয় চিন্তা ও জ্ঞান পৌছুতে ব্যর্থ হয়। এ ক্ষেত্রটি অবশ্যই চুপ থাকার ও বিরত থাকার। সুতরাং এ প্রশ্নে নিজ খেয়ালখুশির মতামত পেশ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহর নিদর্শন সমূহ ঃ

তেমনি আল্লাহ্‌র কুদরতের নিশানা ও তাঁর অবদানের ভেতর সেগুলোই নির্বাচিত করা হয়েছে, যেগুলো শহুরে কিংবা গেয়োঁ, আরব কিংবা অনারব সবাই সমানভাবে বুঝতে পারে। এ কারণেই যে সব আধ্যাত্মিক অবদান শুধু আলেম ও ওলী-দরবেশের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে, সে সবের উল্লেখ করা হয়নি। আর যে সব দুর্লভ অবদান শুধু রাজা বাদশাহ্‌র জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে, সেগুলোরও উল্লেখ করা হয়নি। ফলে আলোচনার জন্যে যে গুলো বাছাই করা হয়েছে, তার ভিতরে আসমান যমীনের সৃষ্টি লীলা, মেঘের বারিবর্ষণ ও নদী-নালা হয়ে তা মাটির বুকে প্রবাহিত হওয়া, তা থেকে নানা ধরনের ফুল-ফল জন্ম নেয়া কিংবা মানুষকে প্রয়োজনীয় কারিগরী শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

তেমনি অনেক জায়গায় মানুষের আত্মিক ও চরিত্রিক ক্রটি-বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে। আত্মিক বিচ্যুতি তাদের এই যে, সুখে ও দুঃখে তাদের কাজ ও স্বভাব একরূপ থাকে না। যখন তাদের বিপদ দেখা দেয়, তখন তারা একভাবে চলে, আর যখন বিপদ দূর হয়, তখন অন্যরূপ হয়ে যায়।

তায্‌ককীরবি- আইয়্যামিল্লাহ ঃ

এভাবে অনুগত বান্দাদের পুরুস্কার ও বিদ্রোহী বান্দাদের শাস্তিদানের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যা কিছু দেখা দিয়েছিল, সেগুলোর ভেতরেও কুরআনে

এমন সব ঘটনা বেছে নেয়া হয়েছে, যেগুলো মানুষ শুনতে অভ্যস্ত ছিল। মোটামুটিভাবে সেগুলো আগে থেকেই তারা শুনে আসছিল। যেমন, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় ও আদ সামুদ সম্প্রদায়ের কাহিনী তারা পুরুষানুক্রমেই শুনে আসছিল। তেমনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও বনী ইস্রাঈলী নবীদের কাহিনীগুলি আরবরা ইয়াহুদীদের সংস্পর্শে থেকে যুগ যুগ ধরে শুনছিল। বস্তুত কুরআনে সে সব ঘটনাই বারংবার বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব ঘটনা আরববাসী কমই শুনেছে কিংবা ইরান বা ভারতের যে সব ঐতিহাসিক কাহিনীর সাথে তাদের কোনই সংশ্রব ছিল না, সেগুলোর উল্লেখ তাতে নেই।

কুরআনের ঘটনা বিণ্যাস ঃ

কুরআনে যেভাবে কোন নতুন ও অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ ঘটানো হয়নি, তেমনি সমগ্র ঘটনার চুলচেরা আলোচনাও পরিহার করা হয়েছে। বরং ঘটনাটির শুধু সে অংশটুকু নির্বাচন করা হয়েছে, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যেটুকুর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ ধরনের ঘটনাবলীর ভেতরে কৌশল ও কল্যাণধর্মিতা হল এই যে, জনসাধারণ যখনই কোন নয়া ও অদ্ভুত কাহিনী শোনে কিংবা তাদের সামনে সবিস্তারে কাহিনীটি তুলে ধরা হয়, তখনই তারা কাহিনীর ভেতরে নিজেদের হারিয়ে ফেলে এবং কাহিনীটি বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য বিলোপ হয়।

বিখ্যাত এক তাপস বলেছেন, যেদিন থেকে মানুষ কুরআনের 'তাজবীদ' (উচ্চারণ তত্ত্ব) শিখ্‌ল, সেদিন থেকেই নামাযের ভেতরে তন্ময়তা হারিয়ে বসল। আর যখন থেকে কুরআনের ব্যাখ্যাদাতারা কুরআন ব্যাখ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব ও দূর-দূরান্তের সম্ভাবনার আলোচনা শুরু করল, ইলমে তাফসীর তখন থেকেই প্রায় লোপ পেল। কুরআনে কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে এ সত্যটিই সামনে রাখা হয়েছে। কারণ যখনই মানুষ কাহিনী শোনার আনন্দে গা ভাসিয়ে দেয়, তখন তার মূল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। নিম্নের এরূপ ঘটনাবলী ও কাহিনীগুলো কুরআনে বারংবার বিভিন্ন পন্থায় উল্লেখ করা হয়েছে।

১। হযরত আদমকে (আঃ) মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা, ফেরেশ্‌তাদের সিজ্‌দা দান ও শয়তানের অহমিকাপূর্ণ অস্বীকার এবং তার মালউন (অভিশপ্ত) খেতাব লাভ ও আদমকে বিভ্রান্ত করার জন্য তার প্রয়াসের কাহিনী এসব এক ধরনের ঘটনাবলী।

২। হযরত নূহ (আঃ) হযরত হূদ (আঃ), হযরত ছালিহ্‌ (আঃ), হযরত লূত (আঃ) ও হযরত শুআয়ব (আঃ)-এর আল্লাহর একত্ববাদ প্রচার ও সত্যের নির্দেশ ও অসত্যের প্রতিবাদের ব্যাপারে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে বিতর্ক ও বিরোধের ঘটনাবলী, সে সব সম্প্রদায়ের নানা ধরনের অমূলক সন্দেহের সৃষ্টি ও সত্যকে

অস্বীকার করার কাহিনী, নবীদের, পক্ষ থেকে তাদের সব সন্দেহের জবাব দানের বিবরণ, সে সব হতভাগাদের উপরে আল্লাহ্‌র গযব নাযিলের ইতিবৃত্ত এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নবী ও তাঁদের অনুসারীদের সাহায্য ও সহায়তা লাভের কিস্‌সা-এসব বিশেষ এক ধরনের কাহিনী।

৩। হযরত মূসা (আঃ) এবং ফিরআউন ও তার সাথীদের ভেতরে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী, হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইস্‌রাঈলের ভেতরকার ব্যাপারগুলো, হযরত মূসা (আঃ) -এর সাথে সে সম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ি ও জবরদস্তি, সে হতভাগাদের ওপর আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হবার সম্ভাবনা এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর কয়েকবার বিভিন্ন সময়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা এ সব বিশেষ এক ধরনের কাহিনী।

৪। হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর ইতিবৃত্ত, তাঁদের মর্তবা ও নিদর্শনের উল্লেখ, হযরত আইয়ুব (আঃ) ও হযরত ইউনুস (আঃ)-এর বিপদ ও পরে তাঁদের ওপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবার বিবরণ, হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মলাভের বিস্ময়কর ঘটনা ও তাঁর বাপ ছাড়া পয়দা হওয়ার ব্যাপার, মাতৃক্রোড়েই তাঁর কথাবার্তা বলা এবং তাঁর থেকে নানা ধরনের আলৌকিক ব্যাপারের প্রকাশ এক ধরনের কাহিনী। সেগুলোকে অবস্থাভেদে কখনও মোটামুটিভাবে, কখনও কিছুটা বিশদভাবে বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

নীচের কিস্‌সাগুলো কুরআনে কেবল দু-একবার বলেই শেষ করা হয়েছে ঃ

১। হযরত ইদরীস (আঃ) কে আকাশে তুলে নেয়ার ঘটনা।

২। নমরূদের সাথে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বিতর্ক, হত্যার পরে পাখিদের আবার জীবিত করার ঘটনা ও ইসমাঈল (আঃ)-এর আত্মদানের ইতিবৃত্ত।

৩। হযরত ইউসূফ (আঃ)-এর কিস্‌সা।

৪। হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্ম লাভ, তাঁকে নীল নদীতে ভাসিয়ে দেয়া, তাঁর একজন কিবতীকে হত্যা করা, তাঁর মাদায়েন সফর ও মাদায়েনে বিবাহ করা, গাছের উপরে আগুনের শিখা দেখা, সে আগুন থেকে কথা শুনতে পাওয়া, গাভী যবেহ্ করার বৃত্তান্ত।

৫। বিলকীসের কিস্‌সা, যুল-কারনায়নের কিস্‌সা, আসহাবের কাহাফের কিস্‌সা, পরস্পর কথোপকথনে লিপ্ত দুব্যক্তির কিস্‌সা, জান্নাতবাসীদের কিস্‌সা এবং আসহাবে ফীলের (গজারোহীদল) কিস্‌সা।

কাহিনীর উদ্দেশ্য ঃ

এ সব কিস্সা-কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য লোকদের কাহিনীগুলো সঠিক ভাবে শুনিয়ে দেয়া নয়; বরং এগুলো বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে শির্ক ও মুশরিকের কিরূপ শোচনীয় পরিণতি দেখা দেয় এবং সে সবের জন্য কিভাবে আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়, তা দেখানো। সঙ্গে সঙ্গে যেন তারা নিশ্চিত হতে পারে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর অনুগত খাঁটি বান্দাদের সর্বদা সহায়তা করে থাকেন।

তাযকিরর বিল-মউত ঃ

কুরআনের এ অধ্যায়টিতে মৃত্যু ও তার পরবর্তীকালের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। মরণকালে মানুষ কিরূপ অসহায় হয়ে যায়, মরণের পরে কিভাবে বেহেশ্ত বা দোযখের পালা আসে, আযাবের ফেরেশ্তারা কেমন করে এসে থাকে ইত্যাদি। তাছাড়া কিয়ামতের নিদর্শন যথা, হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকাশ থেকে অবতরণ এবং দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের অভিযান সম্পর্কিত ঘটনাও রয়েছে। এ প্রসংগে এও বলা হয়েছে, শিংগা কিভাবে ফু'কা হবে, পুণরুত্থান ও পুর্ণবিন্যাস কিভাবে ঘটবে, কিভাবে প্রশ্নোত্তর হবে, ইন্সাফের পাল্লা কেমন করে স্থাপিত হবে এবং আমলনামা কি করে ডান ও বাম হাতে দেয়া হবে। তৎসংগে মুমিনরা যে জান্নাতে আর কাফিররা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাও বলা হয়েছে। কি করে সর্বসাধারণ জাহান্নামীরা সেখানে তাদের নেতাদের সাথে ঝগড়া করবে, তারা কি করে একে অপরের ওপরে দোষ চাপাবে, একে অপরকে গালি দেবে, মুমিনদের কেমন করে আল্লাহ্র সাথে দেখা হবে, কাফিরদের কিরূপ কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, তারও উল্লেখ রয়েছে।

এ অধ্যায়ে আযাবের জন্যে নির্মিত আগুনের কড়া ও শিকল, আর আযাবের বিভিন্ন ধারা যথা, হামীম, গাস্সাক, যক্কুম ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। জান্নাত ও সেখানকার নানারূপ নিয়ামত ও সুখ-শান্তি যথা হুর ও কুসূর, দুধ ও শরবতের নহর, উপাদেয় ও রুচিকর আহার্য, উত্তম ও আকর্ষণীয় পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সুন্দরী নারীদের বর্ণনা রয়েছে। জান্নাতবাসীদের পারস্পরিক চিত্তাকার্ষী সম্পর্ক ও সুমধুর আলাপনের চিত্র আঁকা হয়েছে। আর এ সব কাহিনীগুলো বিভিন্ন সূরায় ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কোথাও ধারাবাহিক কোথাও বা এলোমেলোভাবে বলা হয়েছে। সূরা গুলোর আকৃতি-প্রকৃতি অনুসারে কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও আবার ব্যাপ্তি সহকারে বলা হয়েছে। প্রত্যেক স্থানেই নতুন বর্ণনাভংগী অনুসৃত হয়েছে।

ইলমুল আহকাম সংবিধান পর্যালোচনা মূলতত্ত্ব ঃ

সংবিধান (আহ্কাম) নিয়ে আলোচনা সর্ব প্রথম তত্ত্ব হল এই, আমাদের হযরত (সঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ভেতরে প্রেরিত হয়েছিলেন

বলে তিনি ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সংবিধানকেই যথাসম্ভব রক্ষা করেছেন। প্রয়োজনে কোথাও হয়তো ব্যাপককে বিশেষ কিংবা নির্বিশেষকে সবিশেষ এবং কোথাও বাড়ানো বা কমানো হয়েছে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব হল এই, আল্লাহ্ হযরত (সঃ)-এর সাহায্যে আরববাসীকে পবিত্র করতে চেয়েছিলেন এবং তাদের সাহায্যে অন্যান্য সব রাষ্ট্রের সংস্কার চেয়েছেন। সুতরাং ইসলামী সংবিধানের ভিত্তি আরববাসীর রীতি-নীতি ও অভ্যাসের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করা অপরিহার্য ছিল।

বিকৃত মিল্লাতে ইব্‌রামীর সংস্কার

বস্তুত যদি ইব্‌রাহীমী ধর্মের সংবিধান ও আরববাসীর রীতি-নীতি সামনে রেখে ইসলামী সংবিধান আধ্যয়ন করা হয়, তাহলে আমাদের রাসূর (সঃ) ইব্‌রাহীমী ধর্মানুসারী আরববাসীদের ধর্মের যে সংস্কার ও রদবদলের জন্যে এসেছিলেন, তাঁর প্রতিটি বিধানের কারণ এবং প্রত্যেক বিধি নিষেধের কল্যাণ ধর্মিতা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

সারকথা ইবাদাত অর্থাত পবিত্রতা, নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্জ, যিকির পালনে বড়ধরনের বিপর্যয় ঘটেছিল। আর এই বিপর্যয়ের কারন ও ছিল কয়েকটি। (১) ইবাদত পালনে অলসতা ও অমনোযোগ, (২) অজ্ঞতার কারনে ইবাদাতের পদ্ধতি নিয়ে পরস্পর বিবাদ। (৩) জাহেলী যুগের বিকৃতির অনুপ্রবেশ। এই সমস্ত কারণে মিল্লাতে ইব্‌রাহীমীর মধ্যে যে সকল ক্রটির সৃষ্টি হয়েছিল, কুরআন শরীফ সে গুলোর সংশোধন ও সংস্কার করল এবং সহজ-সরল ও দৃঢ় করল। ফলে মিল্লাতে ইব্‌রাহীমীর আদর্শ গুলো সঠিক ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

ঠিক এভাবেই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও নানা ধরনের কুসংস্কার, অন্যায় অনাচার জন্ম নিয়েছিল। তাই কুরআন তাদের সংশোধনের জন্য নীতিমালা দান করল ও বিধি-নিষেধ আরোপ করল এবং ছগিরা কবীরা গুনাহের সংজ্ঞা দিল, যাতে মানুষ ঐ সমস্ত পাপাচার থেকে নিজেদের কে দূরে রাখে।

কুরআনে নামাযের প্রশ্নটিও সংক্ষেপে সেরে দিয়েছে। শুধু 'ইকামতে সালাত'-এর নিদের্শ জারী করেছে। আমাদের হযরত (সঃ) মোটামুটি সেই নির্দেশের আলোকে মসজিদ গড়লেন, জামাআতে নামায ও নামাযের ওয়াক্ত ইত্যাদি নিয়ম প্রবর্তন করলেন। তেমনি যাকাতের বিধানটিও সংক্ষেপে বলা হল। আমাদের রাসূল (সঃ) তার ব্যাখ্যা দিলেন।

এভাবে কুরআনের বিভিন্ন সূরায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারে আলাদা আলাদা বিধান এসেছে। যেমন, সূরা বাকারায় রোযা ও হজ্জের, সূরা বাকারা, আনফাল ও অন্য

কয়েকখানে জিহাদের, সূরা মায়েদা ও সূরা নূরে দন্ডবিধি,সূরা নিসায় মিরাসের (উত্তরাধিকার-সত্ত্ব) ও সূরা বাকারা, সূরা নিসা ও সূরা তালাকে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধি- নিষেধগুলো এসেছে।

ইশারা-ইঙ্গিতবাহি আয়াতের ব্যাখ্যা দান ঃ

এসব তো সার্বজনীন কল্যাণকর গোটা জাতির জন্যে প্রদত্ত বিধান। এর থেকে আরেকটু এগিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে হযরত (সঃ)-কে প্রশ্ন করায় যে সব জবাব এসেছিল তাও বিদ্যমান। কিংবা মুমিনরা জান-মাল লুটিয়ে যে সব ত্যাগ দেখিয়েছে, মুনাফিকরা সে ক্ষেত্রে যেরূপ স্বার্থপরতা ও কার্পণ্যের পরিচয় দিয়েছে, তার বর্ণনা রয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ্ মুমিনদের প্রশংসা ও মুনাফিকদের ভৎর্সনা করেছেন। হযরত (সঃ)-এর জীবদ্দশায় আল্লাহ্ তাআলা যে শত্রুদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করেছিলেন, তাও দেখা যায়। আল্লাহ্ পাক এ সব ব্যাপারের উল্লেখ করতে গিয়ে মুসলমানদের ওপরে তাঁর ইহ্সান ও অবদানের কথা প্রকাশ করেছেন। এরূপও দেখা গেছে যে, মুসলমানদের ধমক দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে, কিংবা ইঙ্গিতে-ইশারায় কিছু বলে দেয়া হয়েছে। কোথাও বিশেষ ব্যাপারে বাধা-নিষেধের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় তৎক্ষণাত আয়াত এসে গেছে। তাফসীরকারদের কর্তব্য হচ্ছে এই, এরূপ ক্ষেত্রে আয়াতের সংশ্লিষ্ট সেই বিশেষ ঘটনাটি ও সংক্ষেপে বলে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে সংঘটিত বিশেষ যুদ্ধগুলোরও উল্লেখ কুরআনে আছে। সূরা আনফালে বদরের যুদ্ধ, সূরা আল্-ইমরানে ওহুদের যুদ্ধ, সূরা আহ্যাবে খন্দকের যুদ্ধ, সূরা ফাত্হে হুদায়বিয়ার সন্ধি, সূরা হাশরে বনূ নযীরের যুদ্ধ ও সূরা বারাআতে মক্কা বিজয় ও তবুকের যুদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী যেমন বিদায় হজ্জের উল্লেখ রয়েছে সূরা মায়েদায়, যয়নবের বিবাহের কাহিনী রয়েছে সূরা আহযাব ও সূরা তাহরীমে, মিথ্যা অপবাদের (হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কিত) কাহিনী রয়েছে সূরা নূরে, জিনের সাথে রাসুলের (সঃ) সম্পর্কের কথা রয়েছে সূরা জিন ও আহ্কাফে, মসজিদে যেরারের (বিভেদমূলক) কথা রয়েছে সূরা বারাআতে এবং মিরাজের বর্ণনা মিলে সূরা বনী ইসরাঈলে।

এসব আয়াত মূলত 'আইয়্যামিল্লাহর অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু যেহেতু এগুলোর তাৎপর্য বুঝা সংশ্লিষ্ট কাহিনীর ওপরে নির্ভর করে, তাই এগুলোকে ভিন্ন একটা শ্রেণী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাফসীরকাররা যেন এ ধরনের আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি অবশ্যই উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআনের দুর্বোধ্যতার কারন ও সমাধান

জানা দরকার, কুরআন খালেস ও সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আরববাসী খুব সহজেই নিজ বুঝ-ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান কুরআনের মর্ম বুঝে ফেলত। যার বর্ণনা কুরানেই রয়েছে–

وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ (সূরা ইউসূফ) قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (সূরা যুখরফ) كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ - (সূরা হুদ) তাছাড়া যেহেতু শরীয়ত প্রবর্তক (সঃ)-এর ইচ্ছা ছিল যেন মুতাশাবিহ্ দুর্জ্ঞেয় আয়াতের তাৎপর্য খোঁজার চেষ্টা করা না হয়, আল্লাহ্‌র গুণাবলীর সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক না ওঠে এবং পূর্ণ কাহিনী শোনার দাবী কেউ না তোলে, তাই এসব ব্যাপারে খুব কমই প্রশ্ন উঠেছে। এ ব্যাপারে তাই বলাও হয়েছে কম হাদীস।

কিন্তু যখনই এ দল বিদায় নিলেন, ইসলামের ছায়াতলে অনারবরা ভীড় জমালো, তাদের মাতৃভাষা আরবী না হওয়ায় স্বভাবতই অনেক স্থানে কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবন তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তখনই আরবী অভিধান ও ব্যাকরণ নিয়ে ঘাটাঘাটির প্রয়োজন দেখা দিল।

বস্তুত এ ব্যাপরে কথা কাটাকাটির ধারা শুরু হয়ে গেল। তাফসীর গ্রন্থ লেখা শুরু হল। তাই প্রয়োজন দেখা দিল কুরআনের দুর্বোধ্য স্থানগুলো আলোচনা করা। সংগে সংগে উদাহরণও পেশ করা দরকার। তা হলে আর মুল প্রতিপাদ্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার সময়ে কথা বাড়াবার দরকার হবে না। সে সব স্থান বুঝাতেও কোন বেগ পেতে হবে না।

কালামুল্লাহ দুর্বোধ্য হওয়ার কারণসমূহ ঃ

কুরআনের আয়াত কিংবা তার কোন স্থান বুঝতে কখনো এ জন্যে বেগ পেতে হয় যে, সেখানে ব্যবহৃত কোন শব্দ বা পরিভাষা প্রায় পরিত্যাজ্য বা কম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেহেতু সে শব্দ বা পরিভাষার অর্থ সুস্পষ্ট নয়, তাই গোটা আয়াতের অর্থ বুঝাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ বিপদের প্রতিকারকল্পে দেখতে হবে যে, সাহাবা, তাবেঈন ও অতীতের আলেমরা সে শব্দ বা পরিভাষাটির অর্থ কি বুঝেছেন। এভাবে সেটার সঠিক অর্থ বুঝা যেতে পারে।

কুরআনের দুর্বোধ্যতা সৃষ্টির আরেকটি কারণ ঃ

নাসিখ-মনসুখ সমস্যা অর্থাৎ কোন্ আয়াত পরে এসে আগের কোন্ আয়াত বাতিল করল, তা জানা থাকে না। তাই কুরআনে স্ববিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ফলে সত্যিকারের তাৎপর্য বুঝার পথ থাকে না।

তেমনি শানে নুযূল অর্থাৎ আয়াতটি অবতীর্ণ হবার বিশেষ কারণটির প্রতি লক্ষ্য না থাকায়ও কোন আয়াতের তাৎপর্য ও তার মূল উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দুর্বোধ্যতার কয়েকটি কারণও এরূপ আছে যেগুলো মূলনীতি, ব্যাকরণ, বর্ণনা-রীতি ও ভাষা জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এগুলো না জানার জন্যেও কুরআন দুর্বোধ্য মনে হয়।

✪ বস্তুত কিছু আয়াত এরূপ রয়েছে যার ভেতরে সম্পৃক্ত (মুযাফ) কিংবা গুনান্বিত (মওসুফ) বস্তু অনুল্লেখ (মাহ্যূফ) থাকে।

✪ কখনও এক শব্দের বদলে অন্য শব্দ, এক অক্ষরের বদলে অন্য অক্ষর, এক ক্রিয়ার বদলে অন্য ক্রিয়া এবং এক কর্তার বদলে অন্য কর্তা ব্যবহার করা হয়।

✪ কখনও এক বচনের স্থলে বহুবচন ও বহু বচনের বদলে এক বচন ব্যবহার করা হয়।

✪ কখনও তৃতীয় পুরুষের স্থলে মধ্যম পুরুষ, কখনও বা মধ্যম পুরুষের স্থলে তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার করা হয়।

✪ কোথাও বাক্যের আগের অংশ পরে ও পরের অংশ আগে ব্যবহারের রীতি অবলম্বন করা হয়। কোথাও সর্বনাম অনির্দিষ্ট থাকে।

✪ কখনও একই শব্দ দ্বারা বিভিন্ন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করা হয়। কোথাও পুনরুক্তি ও বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা কাজ সারা হয়েছে। কোথাও আবার সংক্ষেপে ও ইংগিতে বলা হয়েছে।

এ সব যদি লক্ষ্য করা না হয়, তা হলে যথার্থ অর্থ অনুধাবন করা কঠিন হবেই।

এভাবে কুরআনে কোথাও বাক্যালংকার ও ব্যঞ্জনা দ্বারা কাজ নেয়া হয়েছে। স্থানে স্থানে ইংগিত-ইশারা, দূর্জ্ঞেয় শব্দ, আলংকারিক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ সবের দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

সুতরাং যারা কুরআনের ব্যাখ্যাদানের মত সংকটপূর্ণ কাজে হাত দিতে চায় এবং কুরআন নিয়ে গবেষণার সৌভাগ্য অর্জন করতে চায়, তাদের জন্য গোড়াতেই এসব বুঝে নেয়া প্রয়োজন। এ সবের উপমা-উদাহরণগুলো যেন তারা দেখে নেয়। তাহলে এরূপ দূর্বোধ্য জায়গায় তারা বিস্তারিত আলোচনার স্থলে ইংগিত ইশারায় কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উত্তম ব্যাখ্যা-রীতি

কুরআন মজীদের দূর্বোধ্য স্থানগুলোর উত্তম ব্যাখ্যা-রীতি হচ্ছে আদি ব্যাখ্যাকার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত ইবনে আবি তালহা (রাঃ) -এর বর্ণনা। ইমাম বুখারী (রাঃ) তাঁর বিখ্যাত সহীহ্ বুখারী শরীফে প্রায়ই সেই রীতি অনুসরণ করেছেন।

উত্তম ব্যাখ্যার দ্বিতীয় রীতিটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে জহ্হাক নকল করেছেন।

তৃতীয় নিয়মটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) নাফে ইবনে আযরকের প্রশ্নাবলীর জবাবে বর্ণনা করেছেন। এ তিন ধরনের ব্যাখ্যাই আল্লামা সুয়ূতী তাঁর মশহূর গ্রন্থ 'ইতকানে' উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া কুরআনের দূর্বোধ্য স্থানগুলোর আরেকটি ব্যাখ্যা আল্লামা বুখারী (রাঃ) ব্যাখ্যাদাতা ইমামদের থেকে নকল করেছেন। আরেকটি ব্যাখ্যা সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেইন ব্যাখ্যাকারদের থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আমার মনে হয়, এ পুস্তকের পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়ে এ ধরণের ব্যাখ্যাগুলো যদি সে সব আয়াতের শানে নুযূলসহ একত্র করি, তা হলে ঠিক হবে। সে অধ্যায়টিকে স্বতন্ত্র একটি পুস্তক হিসেবে রচনা করলে যার ইচ্ছে হয়, সেটাকে এর অন্তুর্ভূক্ত করেই দেখে নিতে পারবে। আর যদি কেউ সেটাকে আলাদাভাবে করতে চায় তাও পারবে। সবাই নিজ নিজ রুচিমতে কাজ করতে ভালবাসে।

এখানে আরেকটি কথা বুঝে নেয়া দরকার, নিকটতম অর্থে গবেষণা চালিয়ে ও শব্দাবলীর বিভিন্নরূপ ব্যবহার সামনে রেখে বিষয়টিকে আরও ব্যাপকতা ও উন্নয়ন দান করেছেন। এ পুস্তকে কেবল আগেকার তাফসীরগুলোর সমাবেশ ঘটানোই উদ্দেশ্য। তার উপরে টীকা- টিপ্পনী লেখার সঠিক স্থান এটি নয়। প্রত্যেক কথা যথাস্থানেই খাটে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাসিখ মনসুখ সমস্যা

কুরআন বুঝবার যে সব কঠিন ব্যাপার নিয়ে অনেক বিতর্ক ঘটে গেছে, সে সব ব্যাপারে মতানৈক্যও অনেক দেখা দিয়েছে, তার ভেতরে 'নাসিখ' ও 'মনসুখ' আয়াতের পরিচয় অন্যতম।

নাসিখ ও মনসুখ আয়াত নির্ধারনের ব্যাপারে সবচাইতে মুশকিলের ব্যাপার হচ্ছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের তাফসীরকারদের পরিভাষার তারতম্য সৃষ্টি। সাহাবা ও তাবেঈনরা 'নসখ' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, পরবর্তীকালের তাফসীরকাররা সে অর্থে ব্যবহার করেন নি।

পূর্ববতীদের মতে নসখের অর্থ

এ ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেঈনদের সব বক্তব্য যাচাই করলে বুঝা যায় যে, তাঁরা 'নস্খ' শব্দটির আভিধানিক ও মূল অর্থ গ্রহণ করতেন, অর্থাৎ 'একটি বস্তুকে অন্য বস্তুর দ্বারা লোপ করে দেয়া।' অথচ এরূপ অর্থে ব্যবহার করাটা মূলনীতি-নির্ধারক আলেমদের ব্যবহারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মূলনীতি নির্ধারক আলেমদের মতে 'নসখ' অর্থ হচ্ছে, 'কোন এক আয়াতের কোন হুকুম অন্য আয়াতের আরেকটি হুকুম দ্বারা বাতিল করে দেয়া।'

বস্তুত মূলনীতি– নির্ধারকদের কাছে 'নসখ' -এর বিভিন্ন পন্থা হতে পারে। একটি পন্থা হচ্ছে এই।

✪ কোন একটি কাজের চূড়ান্ত সময় নির্ধারণ করে দেয়া হলে সেই নির্ধারিত সময়ের পরে কাজটি আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে। আরেকটি পন্থা হচ্ছে এই, বিশ্লেষণের সাহায্যে যে ব্যাপারটি পরে বুঝা যায়, তার দ্বারা পূর্ববর্তী বস্তুটি মনসুখ বা বাতিল হয়ে যায়।

'নসখ' বলতে তারা এ অর্থও বুঝে থাকেন।

যে, বিশ্লেষণ দ্বারা যদি আয়াতে বর্ণিত কোন শর্ত বা বাধ্যবাধকতা নিষ্প্রয়োজন প্রমাণিত হয় ও সেটা নেহায়াৎ আকস্মিক মনে হয়।

✪ কিংবা কোন ব্যাপক বিধানকে বিশেষ করে দেওয়া হয়।

✪ অথবা এমন কোন রহস্য আবিস্কৃত হয়, যার ফলে মুল বিধান ও কল্পিত বিধানের ভেতরে পার্থক্য ধরা পড়ে, বা মূর্খতাজনিত কোন সংস্কার কিংবা পূর্ববর্তীকালে বিধানগুলো 'মুনসুখ' বুঝা যাবে।

পূর্ববর্তীদের মতে মানসূখ আয়াতের সংখ্যা

পূর্ববর্তী (সাহাবা ও তাবেঈন) তাফসীরকাররা 'নসখ' শব্দটিকে যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছেন, তাতে এ বিতর্কটি বেশ ব্যাপক হয়ে ওঠে। সে ধারা অনুসরণ করে জ্ঞানের পরীক্ষার ক্ষেত্রও প্রশস্ত হয়ে যায়। তার অনিবার্য ফল দাঁড়ায় মতানৈক্যের প্রসারতা। বস্তুত তাদের সব মতগুলো যদি সামনে রাখা হয়, তা হলে 'মনসুখ' আয়াতের সংখ্যা পাঁচ শতেরও উপরে চলে যায়। বরং সে বিভিন্ন মতগুলো যদি বেশী সময় নিয়ে যাচাই করা যায়, তা হলে বুঝা যাবে যে, 'মনসূখ' আয়াত অসংখ্য।

পরবর্তীদের মতে মানসূখ আয়াতের সংখ্যা

পরবর্তীকালের (মূতাআখখিরীন) তাফসীরকাররা 'নসখ' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, সেই বিবেচনায় অবশ্য মনসুখ আয়াতের সংখ্যা অনেক কম হয়। বিশেষ করে আমরা তার যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি, সে হিসাবে তার সংখ্যা কয়েকটি মাত্র আয়াতের বেশী নয়। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইতকানে কতিপয় তাফসীরকার আলেমের অনুসৃত অর্থের বিশ্লেষণ দানের পর তিনি মূতাআখ্‌খিরীনদের ধারামতে মনসুখ আয়াতের বর্ণনায় ইবনে আরাবীর অনুসরণ করেছেন। এ ভাবে তিনি প্রায় বিশটি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু আমার মতে এগুলোর ভেতরেও এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যেগুলোকে মনসুখ বলে আখ্যায়িত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

ইবনূল আরাবীর ব্যাখ্যা ঃ

নিম্নে ইব্‌নূল আরবীর ব্যাখ্যার একটি অংশ সমালোচনাসহ তুলে দেয়া হল।

(১) ইবনে আরাবীর মতে সূরা বাকারার নিম্নের আয়াতটি মনসুখ হয়েছে।

(١) كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ...الخ

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের মৃত্যুপথ যাত্রীদের জন্যে ওসীয়াতের বিধান করবেন।" (সূরা বাকারা-১৮০)

একটি অভিমতের আলোকে মীরাসের আয়াত এসে এটা মনসুখ করেছে। আরেকটি মতে বলা হয়েছে, ওয়ারিসের জন্যে ওসীয়াত সম্পর্কিত হাদীসই একে মনসুখ করেছে। তৃতীয় অভিমত এই, ইজমা (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) অনুসারে হয়েছে। আমার মতে নিম্নের আয়াত উক্ত আয়াতটির নাসিখ (বিলোপকারী)"

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ...الخ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ভেতরে ওসীয়তের বিধান প্রবর্তন করলেন।"

আরেক কথা, ওসীয়াতের হাদীস সেটাকে বিলোপ না করে বরং সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

২। সূরা বাকারার আরেকটি আয়াত–

(২) وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ..الخ

"যাদের রোযা রাখার ক্ষমতা আছে, তারাও রোযার বদলে মিসকীন খাওয়াতে পারে....।" (সূরা বাকারা ১৮৪)

একটি মত এই, নিম্নের আয়াত উপরোক্ত আয়াতটির নাসিখ ঃ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"তোমাদের যার সামনেই রোযার মাস হাযির হবে, সেই রোযা রাখবে।"

(সূরা বাকারা ১৮৫)

কিন্তু আরেকটি মতে আছে, এটি 'মুহকাম' আয়াত।

আমার মতে এর আরেকটি দিক রয়েছে। তা হচ্ছে এই, এ আয়াত অনুসারে যারা খানা খাওয়াবার ক্ষমতা রাখে, তাদের ওপরে 'ফিদিয়াহ্' দান ওয়াজিব। 'ফিদিয়াহ্' দ্বারা এখানে মিস্‌কীন খাওয়াবার অর্থ নেয়া হয়েছে। এখানে 'মারজার (নাম) আগে যমীর (সর্বনাম) এ জন্যে নেয়া হয়েছে যে, মর্তবার দিক থেকে অগ্রগণ্য বুঝাবে। আর যমীর পুংবাচক নেয়ার কারণ হল যে, 'ফিদিয়াহ্' শব্দ দ্বারা এখানে 'তাআম' অর্থ নেয়া হয়েছে। এবং 'তাআম' দ্বারা সদকায়ে ফিত্‌র বুঝানো হয়েছে। কারণ রোযার হুকুমের সংগে সংগেই সদকায়ে ফিতরের হুকুম দেয়া হল। যেরূপ এর পরক্ষণেই আরেক আয়াতে (ওয়ালিতুকাব্বেরুল্লাহা আলা'মা হাদাকুম) ঈদের নামাযের তাকবীরের উল্লেখ রয়েছে, এও ঠিক তেমনি ব্যাপার।

৩। সূরা বাকারার তৃতীয় আয়াত ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ..الخ

"পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপরে যেভাবে রোযা ফরয করা হয়েছিল, তোমাদের ওপরেও সেভাবে রোযা ফরয করা হল।" (সূরা বাকারা ১৮৩)

এ আয়াত মানসুখ হল নিম্নের আয়াতের দ্বারা ঃ

(٣) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ . . الخ

"রমযানের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সংগম বৈধ করা হল ......" (সূরা বাকারা ১৮৭)

কারণ, এ আয়াতে তামছীল (উদাহরণ) রয়েছে। আর তা চাচ্ছে যে, পূর্বেকার ফরয বর্তমান শরীয়ত অনুসারেও ফরয হবার সংগে সংগে এর নিয়ম নীতিও সেরূপ হয়ে গেছে। সুতরাং যে সব কাজ রোযার রাতে পূর্ব-শরীয়াতে হারাম ছিল যথা, ঘুমিয়ে উঠে খাওয়া বা স্ত্রী সহবাস, তা এখনও হারাম ছিল। কিন্তু সে হুকুমের বিলোপকারী হল উপরোক্ত আয়াত।

এ হল ইবনুল আরাবীর উধৃতি। ইবনুল আরাবী আরেকটি মতও উল্লেখ করেছেন। তা এই, উক্ত আয়াতের মর্ম মূলের অনুসৃত কার্য সুন্নাত দ্বারা বাতিল প্রমাণিত হয়েছে।

অবশ্য, আমার মত তা নয়। কারণ আয়াতে রোযা ফরয হবার ব্যাপারে অতীতের শরীয়াতকে যে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, তার সম্পর্ক শুধু ফরয হবার ব্যাপারেই। তাই এর দ্বারা আরবে শরীয়াত নাযিল হবার আগে যে প্রচলন ছিল, সেটাই বদলে দেয়া উদ্দেশ্য ছিল। আমি বহু খুজেও এমন দলীল পেলাম না যাতে প্রমাণ হতে পারে যে, রাসূল (সঃ) আগে এরূপ কোন হুকুম দিয়েছিলেন। আর সেরূপ যদি কোন হুকুম তিনি দিয়েও থেকে থাকেন, সেটাকেও বেশী বললে সুন্নাত পর্যন্ত বলা যেতে পারে।

৪। সূরা বাকারার আরেকটি আয়াত ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ- قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ . . الخ

"তারা তোমাকে মর্যাদার মাসগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দাও, সে সব মাসে রক্তারক্তি মহাপাপ.... ইত্যাদি।" (সূরা বাকারা ২১৭)

নিম্নের আয়াতটি এসে এ আয়াতটিকে বিলোপ করেছে ঃ

وَقَاتِلُو الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً . . الخ

"মুশরিকদের যখন যেখানে পাও, হত্যা কর .... ইত্যাদি।" (সূরা তওবা ৩৬)

কিন্তু, আমার মতে আয়াতটি হত্যাকে হারাম করার বদলে জায়েযের প্রমাণ দেয়। এটার ভঙ্গিটি ঠিক তেমনি, যেমন কোন একটি কারণকে স্বীকার করে নিয়ে সেটাকে গ্রহণ করায় যে, অসুবিধা দেখা দিতে পারে, সেটা তৎসংগে বলে

দেয়া। সুতরাং আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে এইঃ নিষিদ্ধ মাসগুলোয় হত্যা ও রক্তপাত অত্যন্ত বড় পাপের কাজ বটে। কিন্তু তার চাইতেও মারাত্মক পাপ হচ্ছে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা। সুতরাং ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ করার জন্যে প্রয়োজনে নিষিদ্ধ মাসেও হত্যা কার্য চলতে পারে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি এরূপ মর্ম বুঝা যায়।

৫। সূরা বাকারার অপর একটি আয়াত ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ-

"তোমাদের যারা মৃত্যুপথগামী, তারা স্ত্রীদের এক বছরের ভরণপোষণের জন্যে ওসীয়াত করে যাবে।" (সূরা বাকারা ২৪০)

এ আয়াতটি মনসুখ হয়েছে পরবর্তী চার মাস দশদিন ইদ্দত ধার্যকারী আয়াত দ্বারা এবং ওসীয়াতের হুকুম মনসুখ হয়েছে মীরাসের হুকুম দ্বারা। অবশ্য সুক্না (থাকার ব্যবস্থা) সম্পর্কিত হুকুম একদলের নিকট মনসুখ হয়নি। অপর দলের নিকটে 'লা-সুকনা হাদীস এসে মনসুখ করেছে। যেহেতু সব মুফাস্সির এ আয়াতের মনসুখ হবার ব্যাপারে একমত, তাই আমিও মনসূখ মনে করি। কিন্তু এও বলা যেতে পারে যে, আয়াতটি মূমূর্ষের জন্যে ওসীয়াত জায়েয ও মুস্তাহাব বলে প্রমাণ করছে। এবং নারীর জন্যে এ আয়াত অনুসরণের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এ অভিমত হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর। আয়াতটিতেও এ ব্যাখ্যার সমর্থন সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

৬। সূরা বাকারার অন্য এক আয়াত ঃ

وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

"এবং তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর আর গোপনই কর, আল্লাহ্‌র কাছে তারও হিসাব দিতে হবে।" (সূরা বাকারা ২৮৪)

নীচের আয়াতটিকে এ আয়াতের (মর্ম) বিলোপকারী বলা হয়েছে ঃ

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

"কাউকে তার ক্ষমতার বাইরে কোন কিছুর জন্য দায়ী করা হবে না।"

(সূরা বাকারা ২৮৬)

কিন্তু আমার কাছে প্রথম আয়াতটি দ্বারা সাধারণ হুকুম দেবার পরে দ্বিতীয় আয়াতটি দ্বারা সেটার একটি বিশেষ দিক বুঝানো হয়েছে। কারণ প্রথম আয়াতে 'মাফী আন্ফুসিকুম দ্বারা অন্তরের সারল্য বা কুটিলতা বুঝায়। আর তা অন্তরের

বিশেষ অবস্থা বৈ নয়। এ থেকে অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যে সব ভাব জেগে ওঠে, সেগুলো বুঝায় না। কারণ যে ব্যাপারে মানুষের কোন হাতই নেই, সে ব্যাপারে তাকে দায়ী করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

[দুই] সূরা আল-ইমরান

৭। সূরা আল-ইমরানের নিম্নের আয়াতটি ঃ

اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ... الخ

"আল্লাহ্‌কে যতখানি ভয় করা উচিত ঠিক ততখানিই ভয় কর ইত্যাদি।"

নীচের আয়াতটি এসে মনসূখ করেছে বলে বলা হয়ঃ (সূরা আল ইমরান১০২)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ... الخ

"অতঃপর আল্লাহ্‌কে তোমার সাধ্যমত ভয় কর।" (সূরা তাগবুন-১৬)

আরেকটি মত এও বলেছে যে, আয়াতটি মনসুখ নয়, মুহকাম।

এটা অন্য কথা যে, গোটা সূরা আল ইমরানে যদি কোন আয়াতকে মনসূখ বলা যায়, তা এটাই। আমার ধারণা, পয়লা আয়াতে 'হাক্কা তুকাতিহী' দ্বারা শিরক্, কুফর এবং এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো (থেকে বিমুক্তি) বুঝানো হয়েছে। মর্ম এই, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এ সবের কোনই ঠাই নেই। আর দ্বিতীয় আয়াতে যে 'মা-স্তাতা'তুম বলেছে, তার সম্পর্ক কাজের সাথে, বিশ্বাসের বেলায় নয়, কাজের বেলায়। যেমন, ওযু করার সামর্থ্য যে রাখে না, সে তায়াম্মুম করে নিবে। দাঁড়িয়ে যে নামায পড়তে অক্ষম, সে বসে পড়ুক। এ ধরনের ব্যাখ্যার সমর্থনে নীচের আয়াতটি দেখতে পাইঃ

وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ–

(কিছুতেই অমুসলিম হয়ে মরণ বরণ করো না।)

সুতরাং দু'টো আয়াতই যার যার জায়গায় বিশিষ্ট রূপ নিয়ে আছে। কেউ নাসিখও নয়, মনসূখও নয়।

[তিন] সূরা নিসা

৮. সূরা 'নিসা'র নিম্নের আয়াতঃ

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ–

"যারা তোমাদের দাসত্বের অধীনে আছে, তাদেরকে সম্পদে অংশীদার কর।" (সূরা নিসা ৩৩)

মনসুখ হয়েছে সূরা আনফালের নীচের আয়াত দ্বারাঃ

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ–

"সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বংশধরই বিবেচ্য। তাদের একদল আরেক দলের উপরে স্থান পায়।" (সূরা আন ফাল ৭৫)

আমার মতে, আয়াতের বাহ্যিক অর্থ অনুসারে 'মীরাস' কেবল হাকিকী মাওয়ালীর জন্য-প্রতিশ্রুত। মাওয়ালী মীরাসের বদলে বখশিশ ও দানদক্ষিণার অধিকারী। সুতরাং এখানে বিলোপের প্রশ্নই আসে না।

৯। এ সূরার আরেকটি আয়াত ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنُ ..الخ

"যখন বন্টনের ব্যাপার আসে.......ইত্যাদি।" (সূরা নিসা - ৮)

এ আয়াত সম্পর্কে একটি মত তো মনসূখের। অপরটি না মনসূখের। তাদের মতে মানুষ এ কাজে অবহেলা দেখাচ্ছে মাত্র। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এ আয়াত মনসূখ তো নয়। তবে ওয়াজিবের স্থলে মুস্তাহাবের প্রমাণ দেয়। আমার কাছে ইবনে আব্বাস (রাঃ-এর মতটিই ঠিক মনে হয়।

১০. এ সূরারই অন্য আয়াতঃ

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ ... الخ

"যে সব নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়.... ইত্যাদি।" (সূরা নিসা-১৫)

বলা হয়, ওপরের এ আয়াতটি সূরা নূরের আয়াত দ্বারা বাতিল হয়েছে। কিন্তু আমার মতে এ আয়াতও বাতিল হয়নি। বরং তাতে বিশেষ একটা সীমা পর্যন্ত ঢিল দেয়া হয়েছে। যখনই সে সীমায় পৌছে গেল, তখনই রসূল (সঃ) মূল হুকুমটি ব্যাখ্যা করে দিলেন। সুতরাং একে তানসীখ (বাতিলকরণ) বলা যেতে পারে না।

[চার] সূরা মায়েদাঃ

১১. এ সূরার নিম্নের আয়াতঃ

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ..الخ

"মর্যাদার মাসগুলোর রক্তারক্তি হালাল করো না...ইত্যাদি।" (সূরা মায়েদা-২)

বলা হয়, যে আয়াতে মার্যাদার মাসগুলোতে হত্যাকার্যের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, সে আয়াত এসে এ আয়াত বাতিল করেছে। কিন্তু আমার মতে কুরআন মজীদে এমন কোন আয়াত নেই, যার দ্বারা এ আয়াত বাতিল হতে পারে। এমনকি সহীহ্ হাদীস বা সুন্নাতে রসুল দ্বারাও এর অন্য ব্যখ্যা দান করা হয়নি। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ এই হবে, 'যে হত্যাকার্য নিষিদ্ধ, যদি তা মর্যাদার মাসে ঘটে, তার জঘন্যতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়।' যেমন হযরত (সঃ)-ও এক বক্তৃতায় বলেছেন, 'তোমাদের ধন ও শোনিত যতখানি মর্যাদার, ততখানি মর্যাদা রয়েছে এ মর্যাদার মাসের, এ মর্যাদার দেশের।'

এর অর্থ এ নয় যে, অন্য মাসের অন্য দিনে কোথাও মুসলমানদের জানমাল কোন মর্যাদা রাখে না। এর মর্ম হল এই, সর্ব অবস্থায়ই তা পবিত্র। তবে এসব মাসের দিনগুলোতে তার মর্যাদার মাত্রা আরও বেশী।

১২. আয়াতঃ

فَاِنْ جَآؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْاَعْرِضْ عَنْهُمْ ..الخ

"তোমার কাছে এলে হয় তাদের বিচার কর, নতুবা বিরত থাক...ইত্যাদি।
(সূরা মায়েদা ৪২)

মনসুখ হয়েছে নীচের আয়াত দ্বারা"।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ. .الخ

"তাহাদের শাসন কর আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে...ইত্যাদি।" (সূরা মায়েদা ৪৯)

কিন্তু আমার কাছে দ্বিতীয় আয়াতটির মর্ম এই 'যখন আপনি যিম্মীদের কোন ব্যাপারে ফয়সালা করার মনস্থ করেন, তখন আপনার জন্যে প্রয়োজন হল ঐশীগ্রন্থ অনুসারে ফয়সালা করা। তারা কি চায়, সে পরোয়া আপনি করবেন না। মোট কথা, অমুসলিমদের ব্যাপার হলে আমরা তাদের নেতাদের ওপরে ছেড়ে দেব, যেন তারা তাদের বিধান অনুসারে মীমাংসা করে, নতুবা যদি আমরাই মীমাংসা করি, তা হলে আল্লাহর বিধান অনুসারেই করব সুতরাং কোন আয়াতই বাতিল নয়। বরং দুটোই দু'ধরনের হুকুম নিয়ে এসেছে।

১৩. আয়াতঃ

اَوْاٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ... الخ

"অথবা তোমাদের ছাড়া আর দু'জন...ইত্যাদি।" (সূরা মায়েদা ১০৬)

মনসূখ হয়েছে এ আয়াত দ্বারাঃ

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ... الخ

"তোমাদেরই দু'জন বিশ্বস্ত লোক সাক্ষী পেশ করবে--ইত্যাদি।"

(সূরা তালাক-২)

আমার মতে, মূল সত্য হল এই, ইমাম আহমদ শুধু আয়াতের বাহ্যিক শব্দার্থ দেখে যা কিছু বলেছেন। কারণ তাঁর এ মতের সমর্থন করেননি কেউ। অন্যদের কাছে আয়াত দু'টো পরস্পরের ব্যাখ্যা স্বরূপ এসেছে। পয়লা আয়াতটির মর্ম হল এই, 'এমন দু'জন লোক হওয়া চাই যারা তোমাদের আত্মীয় নয়।' সুতরাং অন্য যে কোন দু'জন মুসলিম হলেও হল। আর দ্বিতীয় আয়াতে 'মিনকুম' দ্বারা গোটা মুসলিম জাতি বুঝিয়েছে। সুতরাং দুটো আয়াতে মোটেও বিরোধ নেই। তাই এখানে নাসিখ-মনসুখের প্রশ্নই ওঠে না।।

[পাঁচ] সূরা আনফাল ঃ

১৪. আয়াতঃ

اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ..الخ

"যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল হয়, তাহলে দু'শ জনের ওপরে জয়ী হবে...ইত্যাদি।" (সূরা আনফাল-৬৫)

আয়াতটি তার পরবর্তী আয়াত দ্বারা মনসুখ হয়েছে। এ আয়াত সম্পর্কে তাঁরা যা বলেছেন, আমারও বক্তব্য তাই।

[ছয়] সূরা বারাআত ঃ

১৫. আয়াত ঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ...الخ

"সংখ্যা শক্তিতে হালকা হও বা ভারী হও, জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে সবাই জিহাদে নাম...ইতাদি।" (সূরা বারায়াত-৪১)

এর নাসিখ আয়াত হল এইঃ

(ا) لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَاعَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَاعَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ...الخ

(ب) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ... الخ

অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল, রুগ্ন অন্ধ ইত্যাদি জিহাদে অংশ গ্রহণ না করলে কোন অন্যায় নেই। (সূরা ফাতাহ-৭) (সূরা তাওবা - ৯১)

সুতরাং এ দু'আয়াত বিশেষ কারণে অক্ষম ব্যক্তিদের অব্যাহিত দিয়েছে। তাই ওপরের আয়াতটি মানসুখ হল।

কিন্তু আমার মতে এ আয়াতকে মনসূখ মনে করা ঠিক নয়। কারণ, এর সম্পর্ক হল জিহাদের উপকরণের সাথে, ব্যক্তির সাথে নয়। বস্তুত 'খিফাফান' শব্দের অর্থ হল ন্যূনতম জিহাদের উপকরণ। তা সামান্য যানবাহনই হোক কিংবা সেবক-সেবিকা হোক অথবা কোনরূপ সমরোপকরণ হোক। আর 'ছিকালান' বলতে জিহাদের সর্বাধিক সৈন্য ও যানবাহন বুঝায়। এবং যে দু'আয়াতকে এর নাসিখ বলা হয়, সে দু'টোর সম্পর্ক হল অক্ষম লোকের সাথে। সুতরাং এ দু'টো পয়লা আয়াটির নাসিখ হতে পারে না। কমপক্ষে এটা বলা চলে যে, এখানে নাসিখ সুনির্দিষ্ট নয়।

[সাত] সূরা নূর

১৬। আয়াতঃ

اَلزَّانِى لَايَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً... الخ

"ব্যভিচারী ব্যভিচারিণী ছাড়া বিয়ে করবে না।...ইত্যাদি।" (সূরা নুর-৩)

ইবনে আরাবীর মতে নিম্নের আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়েছেঃ

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ...الخ

আমার মতে, এখানেও ইমাম আহমদ (রঃ) শুধু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ওপরে নির্ভর করেছেন। অন্যদের কাছে এ আয়াত মনসুখ নয়। কারণ এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে, কবীরা গুনাহ্ যে করে, সে-ই কেবল যেনাকারিণীর 'কুফু' (সমপর্যায়ের) হতে পারে। কিংবা তার জন্যেই যেনাকারিণী বিয়ে করা চলে।

অপর যে আয়াতে হারাম বলা হয়েছে, তার সম্পর্কে যেনা ও শিরক্ দু'টোর সাথেই। সুতরাং এ আয়াতও নাসিখ হতে পারে না। তাছাড়া যে আয়াতকে নাসিখ ধরা হয়, তার সম্পর্ক রয়েছে সাধারণ হুকুমের সাথে। এবং কোন সাধারণ হুকুম বিশেষ ধরনের হুকুম দ্বারা বাতিল হতে পারে না। এ হিসেবেও নসখ ঠিক নয়।

১৭. আয়াতঃ সূরা নূর

لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. . الخ

"এটা এ জন্যে যে, তোমাদের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে তোমাদের অধীনদের ব্যাপারে...ইত্যাদি।" (সূরা নুর- ৫৮)

এ আয়াত সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে অনেক। কিছু লোক এটাকে 'মনসূখ' মনে করে। কিছু লোক আবার তা মনে করে না। বরং মুসলমানরা এটা কার্যকরী করার ব্যাপারে ঔদাসীন্য দেখাচ্ছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতকে মনসূখ মনে করেন না বরং তাঁর বক্তব্যই সবচাইতে সঠিক। কারণ তাঁর সমর্থনে জোরালো যুক্তি ও কারণ বর্তমান রয়েছে। সুতরাং এ মতটির ওপরে নির্ভর করা যেতে পারে।

[আট] সূরা আহ্যাব

১৮. আয়াতঃ لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ. . الخ

"তোমার জন্যে এর পরে সেই নারী বৈধ নয়...ইত্যাদি।" (আহযাব ৫২)

এ আয়াত নীচের আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়েছে।

اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللّٰتِىْ. . الخ

"নিশ্চয়ই আমি বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদের...ইত্যাদি।" (সূরা আহখাব ৫০)

আমার মতে আলোচ্য আয়াতটির তিলাওয়াতই মনসুখ হয়ে গেছে। এটাই সত্য ও সঠিক কথা।

[নয়] সূরা মুজাদালা

১৯. আয়াতঃ اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا. . . الخ

"যখন তোমরা রসূলের সাথে বিশেষ পরামর্শ করবে, আগে নজরানা দিবে...ইত্যাদি।" (সূরা মুজাদালা-১২)

ইবনে আরাবী (রাঃ)-এর মতে এর পরবর্তী আয়াতটি এটাকে বাতিল করে দিয়েছে। এখানে আমিও ইবনে আরাবীর মত সমর্থন করি।

[দশ] সূরা মুমতাহিনা

২০. আয়াতঃ

فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا اَنْفَقُوْا . . الخ

"ঈমান ও কুফরীর ব্যবধানের জন্য যাদের স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হল, তাদের খরচ আদায় কর...ইত্যাদি।" (সূরা মুমতাহিন-১১)

একটি মত অনুসারে এ আয়াত 'সায়িফ' -এর আয়াত দ্বারা মানসুখ করা হয়েছে। আরেকটি মতে এ আয়াত মানসুখ করা হয়েছে গনীমতের আয়াত দ্বারা। তৃতীয় দলের মত হচ্ছে, এ আয়াত আদৌ মানসুখ হয়নি। এটি মহ্‌কাম আয়াত। আমার কাছে আয়াতটি তো মুহ্‌কাম, কিন্তু এর হুকুম সাধারণ (আম) নয়। এর সম্পর্ক হল মুসলমানদের দুর্বল অবস্থার সাথে সংযুক্ত কাফিররা যখন সবল ও শক্তিশালী ছিল, সে সময়ের জন্যে এ আয়াত।

[এগার] সূরা মুয্‌যাম্মিল

২১. আয়াতঃ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا . . . الخ

'প্রায় রাতই জেগে কাটাও...ইত্যাদি।'

এ আয়াতকে এ সূরার শেষের আয়াত দ্বারা মানসুখ করা হয়েছে। মানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হুকুম এসে একে মানসুখ করেছে। কিন্তু আমার মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হুকুম দিয়ে একে মানসুখ করা ঠিক নয়। মূল সত্য হল এই, সূরার শুরুতে রাত জাগার যে হুকুম রয়েছে, তা মুস্তাহাবে মুআক্কাদা ছিল। পরের আয়াত এসে তাকীদ বাতিল করে শুধু মুস্তাহাব বাকী রেখেছে।

আল্লামা সুয়ূতীও ইবনে আরাবীর অনুসৃত অভিমত সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন, কেবল উপরের আয়াতটুকুই মনসুখ হয়েছে। যদিও তার ভেতরে কিছু কিছু আয়াতের তানসীখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু এসব আয়াত ছাড়া আর কোন আয়াতের তানসীখ দাবী করা একবারেই ভিত্তিহীন। বেশী খাটি কথা তো সেগুলোও মনসুখ নয়। এ হিসেবে মনসুখ আয়াতের সংখ্যা আরও কমে যায়।

উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আমার কাছে পাঁচটি আয়াতের বেশী মানসুখ নয়। তাই কেবল সেই পাঁচটি ;আলোচ্য আয়াতের তানসীখই দাবী করা যেতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে

শানে নুযূলঃ

কুরআন বুঝার ও তাফসীর করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মুশকিল বিষয় হল,'শানে-নূযূল' সম্পর্কিত জ্ঞান। অর্থাৎ সঠিকভাবে কোন্ আয়াত কখন কি ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, তা অবহিত থাকা। এখানেও সমস্যা হল এই শানে নুযূল বর্ণনার ক্ষেত্রে যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী (মুতাকাদ্দিমীন) ও পরবর্তীদের (মুতাআখ্খিরীন) ভেতরে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে।

শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে 'নুযিলাত ফী কাযা'-(এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে) এরূপ বলা হয়। কিন্তু সাহাবা ও তাবেঈনদের সব বক্তব্য যাচাই করলে জানা যায়, তাঁদের ভেতরে এরূপ কথা অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হ'ত। অর্থাৎ এরূপ পরিভাষা যে কোন্ উপলক্ষে হযরত (সঃ)-এর সময়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, সে জন্যেই ব্যবহার করতেন না। উপরন্তু সে যুগে এ আয়াত দ্বারা যা কিছু বুঝানো হয়েছে, সব কিছুর জন্যে তাঁরা এরূপ পরিভাষা ব্যবহার করতেন। তা রসুল (সঃ)-এর যুগেরই হোক কিংবা পরবর্তীকালের। এরূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা আয়াতের সব শর্তের সাথে সে ব্যাপারের সামঞ্জস্য অপরিহার্য ভাবতেন না। বরং আয়াতের হুকুম যে যে বস্তুর ব্যাপারে প্রযোজ্য হত, সবখানেই ব্যবহার করতেন।

তা ছাড়া এরূপও ঘটেছে যে, রসূল (সঃ)-এর কাছে কখনও কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কিংবা তার পবিত্র জীবনকালে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেছে, সে ব্যাপারে তিনি কুরআনের কোন আয়াত থেকে কোন হুকুম বের করে সংগে সংগে সে আয়াতটি পড়ে শুনালেন। সাহাবারা এরূপ ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। সে আয়াত সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা সেরূপ ঘটনা বিবৃত করে পরে বলতেন 'নুযিলাত ফী কাযা'।

এমনকি তাঁরা এরূপ স্থলে 'নুযিলাত ফী কাজা' ছাড়াও অন্যরূপ বাক্যাংশ যেমন "ফা-আনযালাল্লাহু তা'আলা কওলাহু (তখনই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন) কিংবা 'ফা-নাযালাত' (তখনই অবতীর্ণ হল) ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। এসবের দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু এই যে, রসুল (সঃ) এসব ব্যাপারে এ আয়াত থেকে মাসআলা বের করেছেন।

এছাড়া এও সম্ভব যে, তাঁরা যে যে স্থানে এরূপ ব্যবহার করতেন, হয়তো তাঁরা তা যথার্থ অর্থেই ব্যবহার করতেন। কারণ রসূল (সঃ)-এর কোন আয়াত থেকে হুকুম বের করা কিংবা কোন ব্যাপারে তাঁর খেয়াল কোন আয়াতের দিকে আকৃষ্ট হওয়া মূলত আল্লাহ্‌র ইংগিতেই হত। আল্লাহ্‌র ইংগিতও তো এক প্রকার ওহী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সবখানেই অনুরূপ ভাষা ব্যবহার সব দিক থেকেই যথাযথ হয়েছে।

এরূপ ক্ষেত্রে কেউ যদি বলে যে, যেসব ব্যাপারে হযরত (সঃ) যে যে আয়াত পাঠ করেছেন, মূলত আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই সে সব নাযিল হয়েছিল, তাও সঠিক মানতে হবে। আদতে কারণ যাই দেখান হোক না কেন, এ কথা সত্য যে, সাহাবারা 'নূযিলাত ফী কাযা' বাক্যাংশটি নাযিলের মূল ঘটনাটি ছাড়া অন্যক্ষেত্রেও ব্যবহার করতেন।

মুহাদ্দিসদের ধারাঃ

মুহাদ্দিসরা কুরআনের আয়াতের আলোচনা প্রসংগে এরূপ বহু কিছু ব্যাপার বর্ণনা করেন, যা শানে নুযুলের ভেতরে শামিল নয়। যেমন, কোন কোন সময়ে সাহাবারা পারস্পরিক বাদানুবাদ প্রমাণ হিসেবে কুরআনের আয়াত পেশ করতেন। কখনও তাঁরা উদাহরণ স্বরূপ কোন আয়াতের উল্লেখ করতেন। কিংবা নিজ দাবী প্রমাণের জন্যে রসূল (সঃ) এরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে যে আয়াত পাঠ করেছিলেন, তা উল্লেখ করতেন। কখনও সে আয়াত সংশ্লিষ্ট কোন হাদীসের সাথে উল্লেখ করতেন। মুহাদ্দিসরা এ সবকিছুই সে আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বর্ণনা করে থাকেন। আর তার পেছনে কখনও নাযিলের স্থান বলা হয়, কখনও অনিদিষ্টভাবে তাদের দিকে ইংগিত করা হয়, যাদের ব্যাপারে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। আবার কখনও কুরআনের শব্দগুলোর বিশুদ্ধ উচ্চারণ বের করা হয়, কোন সময়ে সূরা ও আয়াতের ভেতরে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, আবার কখনও কুরআনের কোন হুকুমের ব্যাপারে রসুল (সঃ) কিভাবে কাজ নিতেন, তা বলে দেয়াই উদ্দেশ্য থাকত।

তাফসীরকারদের দায়িত্বঃ

মুহাদ্দিসরা কোন আয়াত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেন, তা একে তো শানে নুযূলের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না, তদুপরি তাফসীরকারদের জন্যে তা আলোচনা করা জরুরীও নয়। তাফসীরকারদের জন্যে শুধু দু'টি ব্যাপারে জ্ঞান থাকা দরকার একটি হল, আয়াত যে ঘটনার দিকে ইংগিত দেয়, তা জানা। কারণ তা না জেনে আয়াতের সঠিক অর্থ অনুধাবন সম্ভব নয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যে ঘটনার জন্যে কোন

সাধারন হুকুম বিশেষ রূপ নিয়েছে, সেটি জানা। অর্থাৎ যে ঘটনার কারণে আয়াতের বাহ্যিক অর্থ ঘুরে অন্য অর্থ প্রকাশ পায়, তা না জেনে আয়াতের সঠিক মর্ম নির্ণয় করা অসম্ভব। এ দু'ধরনের ঘটনা ছাড়া আর সব ব্যাপার জানা তাফসীরকারের জন্যে প্রয়োজনীয় নয়।

এ প্রসংঙ্গে অতীতের নবীদের কাহিনী ও ঘটনাবলী এসে যায়। কারণ অধিকাংশ কাহিনী অস্পষ্ট ও অনাবশ্যক। এঁ জন্যে তাঁদের কাহিনী হাদীসেও কম বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরকারগন তাঁদের যে লম্বা-চওড়া কাহিনী বর্ণনা করেন, তা হাদীসের বদলে আহ্‌লে কিতাব আলেমদের থেকে পেয়ে থাকেন। এগুলো সম্পর্কে সহীহ্‌ বুখারীর এক রেওয়াতে আমাদের উপদেশ দেয়া হয়েছেঃ আমরা সেগুলো সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলবনা। এতে পরিষ্কার বুঝায়, সেগুলোর উপরে আমাদের গুরুত্ব না দেয়াই উচিত।

এছাড়া সাহাবা ও তাবেঈনদের সময়কার মুশ্‌রিক ও ইয়াহুদীদের ধর্মবিশ্বাস ও মুর্খতাজনিত রীতি-নীতি তুলে ধরার জন্যে অনেক ছোট-খাট ঘটনাও তাঁরা বলে গেছেন। সে সব ঘটনা বলতে গিয়েও তাঁরা 'নূযিলাত ফী কাযা' বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। অথচ তা বলার উদ্দেশ্য ছিল, এ ধরনেরই এক ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল।

সাহাবা ও তাবেঈনরা মুশ্‌রিক ও ইয়াহুদীদের বিশ্বাস ও রীতিনীতির যে সব ঘটনা উল্লেখ করতেন, তা শুধু কাহিনীর অবতারণার জন্যে নয়; বরং আয়াতটি কিরূপ ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছিল, তার সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্যেই করতেন। এজন্যে তাদের বর্ণনায় স্ব-বিরোধ ও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি বক্তব্য আলাদা পথের ইঙ্গিত দেয়। মূলত সবগুলোর উদ্দেশ্য ছিল এক। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু দ্দারদা (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি একই আয়াত বিভিন্ন ব্যাপারে না লাগাতে পারে, সে ফকীহ্‌ হতে পারে না। এখানেও তিনি উপরে বর্ণিত রহস্যের দিকেই ইংগীত করেছেন।

কুরআনে এ ধরণের এমন বহু স্থান রয়েছে, যা থেকে একই সময় বিভিন্ন অবস্থা প্রকাশ পায়। এক অবস্থা তো পূণ্য ও সৌভাগ্যের, আরেকটি পাপ ও দুর্ভাগ্যের। সৌভাগ্যবানের অবস্থার সাথে কিছু সৌভাগ্যমূলক গুণের সমাবেশ থাকে, আর হতভাগ্যের অবস্থার সাথে কিছু দুভাগ্যপূর্ণ দোষগুলো বর্ণিত হয়। কিন্তু এ উভয় অবস্থায়ই ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ইঙ্গিত থাকে না। বরং এ ধরনের কার্য ও দোষগুণ সম্পর্কিত বিধান বর্ণনাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমনঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا

ووضعته كرها-

"মানুষকে বাপ মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের উপদেশ দিলাম, যারা কষ্ট করে তাদের জন্ম দিয়েছে আর লালন-পালন করেছে।" (সূরা আহকাফ-১৫)

এ আয়াতের পরে ভাল ও মন্দ দু'দলের অবস্থাই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

"যখন তাদের কাছে তোমাদের প্রভুর থেকে অবতীর্ণ বানী শোনানো হত তখন তারা বলত, সব তো সেকেলে আর পচা কাহিনী।" (সূরা নাহল - ২৪)

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا خَيْرًا-

"যারা আল্লাহ্‌ভীরু তাদের কাছে যখন তোমাদের প্রভু থেকে অবতীর্ণ বাণী বলা হয়, তারা বলত, উত্তম বাণী।" (সূরা নাহাল-৩০)

এ আয়াতের পরেও পূণ্যবান ও পাপী দু'দলেরই অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নের আয়াতগুলোকে এ ধরনের আয়াতের অন্তর্ভূক্ত করা চাই।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً

"আল্লাহ্ পাক পল্লীল উদাহরণ দিলেন, যেটা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত।"

(সূরা নাহাল ১১২)

(١) هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا... الخ

"সেই মহান প্রভুই তোমাদের একটি মাত্র সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে স্ত্রীও পয়দা করেছেন যেন তা নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারে...ইত্যাদি।

(٢) قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

"অবশ্যই ঈমানদাররা সফলকাম হয়েছে–তারাই সশঙ্ক চিত্তে নামাযে নিরত হয়।" (সূরা মুমিন ১/২)

(٢) وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ... الخ

"কথায় কথায় শপথকারী লাঞ্ছনাদাতাদের আদৌ অনুসরণ করো না...ইত্যাদি।" (সূরা কলম-১০)

এ সব অবস্থায় এটা প্রয়োজন নয় যে, আয়াতে যে সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে ব্যক্তি বিশেষের ভেতরে মিলবে। যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছেঃ

كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

"দানের উপমা হচ্ছে যেন একটি দানা থেকে সাতটি ছড়া ও প্রতি ছড়া থেকে শত দানা বের হল।" (সূরা বাকারা ২৬০)

এ আয়াতে উদাহরণের জন্যে এমন একটা বীজের কথা বলা হয়েছে, যা থেকে সাতটি ছড়া এবং প্রতি ছড়া থেকে শত দানা বের হয়। কিন্তু তার অর্থ এ নয়, এরূপ দানাই মিলবে। এখানে শুধু বিনিময় ও সওয়াবের আধিক্যের চিত্র তুলে ধরাই উদ্দশ্য। এ ধরনের স্থানে সব বৈশিষ্ট্য কিংবা তার অধিকাংশ বর্তমান থাকা নেহায়াৎই অপ্রয়োজনীয় শর্ত।

কুরআনে কোথাও আরও এক ধরনের বর্ণনারীতি লক্ষ্যনীয়। অর্থাৎ আহ্কাম সম্পর্কে বর্ণনায় যদি এমন কোন স্থান এসে যায় যা সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে, সেখানে তা দূরও করা হয়েছে। অথবা বর্ণিত বিধান সম্পর্কে যদি কোন স্বতঃস্ফূর্ত প্রশ্ন দেখা যায়, আলোচনা প্রসংগে তার জবাবও দেয়া হয়েছে। এ ধরনের বর্ণনার উদ্দেশ্য শুধু এটাই হয়ে থাকে যে, বলে আসা কথাটি সুপ্রমাণিত করা। এ নয় যে, এরূপ আয়াত শুনে সত্যিই কেউ প্রশ্ন তুলেছিল; কিংবা আদতেই কেউ কোন সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।

কিন্তু সাহাবাদের অভ্যাস ছিল এই, যখনই তাঁরা এ ধরনের আয়াত নিয়ে বাদানুবাদ চালাতেন, আগে প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে নিতেন। তাঁরা প্রশ্নোত্তরের ধারায় আয়াতের মর্ম বলে যেতেন। বস্তুত এসব স্থানগুলো যদি তলিয়ে দেখা হয়, তাহ-লে জানা যায়, গোটা বাক্য একটি পূর্ণ বাক্য মাত্র। সেখানে নাযিলের ধারাবা-হিকতা রেখে কোন অংশকে আগ্-পিছ্ করার ফাঁক নেই। একটি সুবিন্যস্ত বাক্য; এর স্থান বদল কিংবা বাক্যের গাঁথুনি ভেংগে নেয়া রীতি বিরুদ্ধ বটে।

সাহাবাদের এও রীতি ছিল যে, কুরআনের আয়াতের মর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরা আয়াতের আগ্-পিছ্ করতেও ছাড়তেন না। তার অর্থ এ নয় যে, নাযিলের সেটাই ধারাবাহিক রূপ বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। এরূপ সাজানোর ক্ষেত্রে

তাঁরা আয়াতের গুরুত্ব বিচার করতেন।

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ..الخ

"যারা সোনা-রূপা জমা করে...ইত্যাদি।" (সূরা তাওবা - ৩৪)

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ) উপরোউক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, যাকাতের আয়াতের আগে এটা নাযিল হয়েছিল। এ পর্যন্ত সোনা, রূপা জমা করা নিষিদ্ধ ছিল।

যাকাতের আয়াতে সম্পদের শুদ্ধিকরণ ব্যবস্থা হয়ে গেল। এর পর থেকে তা জমানো বৈধ হল।

অথচ সবাই জানে যে সূরা বারাআত সবচেয়ে পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতটি তারই অন্তর্ভূক্ত। পক্ষান্তরে যাকাতের আয়াত তার অনেক আগে এসেছে। কিন্তু ইবনে উমর (রাঃ) এখানে যে আগ্-পিছ্ দাবী করেছেন, তা সাধারণ হুকুমের উপরে বিশেষ হুকুমের ভিত্তিতে।

মোটকথা, তাফসীরকারের জিম্মাদারী হচ্ছে এতটুকু যে, তারা এ সব বিভিন্ন পরিস্থিতির ভেতরে কেবল দুটি ব্যাপার খেয়াল রাখবে। প্রথম, যে সব যুদ্ধ ও ঘটনার দিকে আয়াতের ইংগিত রয়েছে এবং যে আয়াতের মর্মোদ্ধার তা ছাড়া চলে না, সেগুলো বলে দেবে। দ্বিতীয়, আয়াতে যদি এমন কোন বিশেষত্ব, শর্ত কিংবা রহস্য থেকে থাকে যা শানে নুযূল না বললে বুঝা যায় না, সেখানে শানে নুযূল বলা।

যদিও দ্বিতীয় শর্তটি তাফসীর বিষয়ক নয়-তাওজীহ্ বিষয়ক, তথাপি তাফসীর শাস্ত্রেও এর প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই তাফসীরকারদের এটাও বলা কর্তব্য। তাওজীহ শাস্ত্র আলাদা এক বিষয়। তাতে বাক্যের এমন সব চুলচেরা বিশ্লেষণ থাকে, যাতে করে সে সম্পর্কে সব প্রশ্নের নিরসন ঘটে।

সারকথা ঃ

ওপরের সব আলোচনার সার হল এই, আয়াত কখনো অস্পষ্ট মনে হয় এবং তার বাহ্যিক অর্থ যা প্রমাণ করতে চায়, তা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কখনো আবার আয়াতের মাঝে এরূপ অসংলগ্নতা দেখা যায় যাতে করে এক নবীশের পক্ষে তার অর্থ বুঝাই দায় হয়ে থাকে। কিংবা আয়াতের কোন বিশেষত্ব বা শর্ত

তার মাথায় খেলে না। তাফসীরকার যখন সে সব স্থান আলোচনা করবে, সব জটিলতা দূর করবে। এটাকেই বলা হয় তাওজীহ্ (বিশ্লেষণ)। যেমন এ আয়াতটিঃ

يَاأُخْتَ هَارُوْنَ مَاكَانَ اَبُوْكِ اِمْرأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا. الخ

"হে হারুণ-ভগ্নি, তোমার পিতা পাপী ছিলো না এবং তোমার মাতাও আল্লাহ্ দ্রোহী না.... ইত্যাদি।"

এখানে 'হে হারুন-ভগ্নি 'সম্বোধন দ্বারা ফিলিস্তিনবাসী, হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পরে হযরত মরিয়ম (রাঃ)-কে ডেকেছে। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন তোলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুসা (আঃ)-এর ভেতরে তো কয়েক হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে। সেক্ষেত্রে কি করে হারুন মরিয়মের ভাই হলেন?

এ বিভ্রান্তির কারণ হচ্ছে, হযরত মূসা (আঃ)-এর ভাই হারুনকেই মরিয়মের ভাই ভাবা। হযরত (সঃ) এ প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন, এ আরেক হারুন যিনি মরিয়মের ভাই এবং হযরত হারুন (আঃ)-এর নামের বরকতের জন্যে তাঁর এ নাম রাখা হয়েছিল। বনী ইসরাঈলীদের রীতিই ছিল বুযুর্গদের নামে নাম রাখা।

এভাবে একটি আয়াত সম্পর্কে হযরত (সঃ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কিয়ামতের দিন মানুষ পা শুন্যে তুলে ভয় করে চলবে কি করে? তিনি জবাব দিলেন, যে পবিত্র সত্তা মানুষকে দুনিয়ায় পায়ে ভর করে চলার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তিনিই তাদের সেখানে মাথায় ভর করে চলার শক্তি দেবেন।

একবার আদি ব্যাখ্যাবিদ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে দু'আয়াতের ভেতরে বাহ্যদৃষ্ট বিরোধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যে, এক আয়াতে বলা হয়েছে, "একে অপরকে কোন প্রশ্ন করবে না" এবং দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে, "পরস্পর বাদানুবাদ হবে'– এ দুয়ের সমন্বয় কি করে সম্ভব?

তিনি জবাবে বললেন– পয়লা আয়াতে বিচার দিনের এবং দ্বিতীয়টিতে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে। বিচার দিনে কারুর কিছু বলার হুঁশ থাকবে না এবং জান্নাতে পৌঁছে তবে আলাপের অবসর মিলবে। তখনই বাদানুবাদ চালাবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে একদিন প্রশ্ন করা হল, সাফা-মারওয়ায় দৌড়াঁদৌড়ি যদি ওয়াজিব হয়, তা হলে কুরআনে কেন 'লা-জুনাহ' (ক্ষতি নেই) বলা হল। তিনি জবাব দিলেন– ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও একদল লোক এড়িয়ে চলত। তাদের লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে– হজ্জই যখন করছ, তখন এ ওয়াজিবটি পালন করলে কোন ক্ষতি নেই।

হযরত উমর (রাঃ) একবার হযরত (সঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, সদকার হুকুমের সাথে 'ইন খিফতুম (যদি তোমরা ভয় পাও) শর্ত টি কেন লাগল? হযরত (সঃ) জবাব দিলেন– দাতারা তো দানে কষ্ট পায় না; বরং আনন্দ পায়। সুতরাং এখানে আল্লাহ্ এ শর্তটি বিশেষ উদ্দেশ্যে লাগান নি, এমনিই বলে দিয়েছেন।

মোদ্দাকথা, তাওজীহ্ সম্পর্কিত উপমা– উদাহরণ খুঁজলে অসংখ্য মিলবে। এখানে আমার উদ্দেশ্য হল কেবল তাওজীহ্ সম্পর্কে সঠিক ধারণা জানানো।

এ প্রসংগে বুখারী, তিরমিযী ও হাকাম শানে নুযূল ও তাওজীহ্ সম্পর্কে যা কিছু লিখেছে, আমি পঞ্চম অধ্যায়ে সংক্ষেপে সেগুলো হযরত (সঃ) কিংবা সাহাবা পর্যন্ত সংযোগ রক্ষা করে বলে দেয়া ভাল মনে করি। এতে দুধরনের উপকার হবে। এক তো এতটুকু জানা সব তাফসীরকারের জন্যে অপরিহার্য। যেমন অপরিহার্য কুরআনের কঠিন স্থানগুলো ব্যাখ্যার জন্যে আমি যে সবের উল্লেখ করেছি, সেগুলো জানা। দ্বিতীয়, এর ফলে এটা পরিস্কার হবে যে, অধিকাংশ আয়াত বুঝার জন্যে শানে নুযূল দরকার হয় না। বস্তুত সে জন্যে কম ঘটনাই উল্লেখ করতে হয়।

এ কারণে তাফসীর শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য ও বিশুত্রতম গ্রন্থদ্বয়ের ভেতরে ঘটনার সমাবেশ কম রয়েছে। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ওয়াকিদী ও কালবী এ ব্যপারে বড় বেশী উদার হয়েছেন। প্রত্যেক আয়াত প্রসংগে কোন না কোন কাহিনী বলে দিয়েছেন। তার অধিকাংশই মুহাদ্দিসদের কাছে অশুদ্ধ বিবেচিত হয়েছে। কিংবা তার সূত্র সন্দেহপূর্ণ। এ ধরনের সন্দেহপূর্ণ ও ভুল কাহিনী তাফসীর গ্রন্থের শর্ত করে নেয়া নির্ভেজাল ভ্রান্তি বটে। এ ধরনের ঘটনাগুলোকে কুরআন বুঝার ভিত্তি করে নেয়া আদতে নিজকে কুরআনের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রাখা বৈ আর কিছু নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

এ অধ্যায়ে আরও কয়েকটি আলোচ্য বিষয় রয়েছে। কুরআন বুঝার বিদ্যায় সেগুলো প্রয়োজন। তার একটি হল, হয্ফ (উহ্য) সমস্যা। অর্থাৎ বাক্যে কোন অংশ উহ্য রেখে বাক্যটির অর্থ অনিশ্চিত করে ফেলা। দ্বিতীয়টি হল এবদাল (পরিবর্তন)। অর্থাৎ এক বস্তুকে অপর বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করা। তৃতীয় তাকদীম– তাখীর (আগ্-পিছ করা)। অর্থাৎ আগের উল্লেখ্যকে পিছে ও পিছের উল্লেখ্য বস্তুকে আগে আনা। চতুর্থ হচ্ছে, মুতাশাবিহাত (রূপক) ও তা'রীজাত অল কিনরায়ত (ইংগিতময়) বাক্য ব্যবহার। অর্থাৎ মর্ম, তত্ত্ব ও মূল লক্ষ্যের এমন একটি বাস্তব ও বোধগম্য চিত্রদান যা আসল বস্তুর সাথে সম্পর্ক রাখে। আরবী পরিভাষায় এটাকে বলে 'ইস্তেআরা বিল কেনায়াহ বা মাজাযে আকলী। এসব ব্যাপার এমন যে কখন ও মূল বস্তু বুঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। নিম্নে এর সবগুলোর আলাদা উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে। ফলে জটিলতা দূর হয়ে কুরআন সহজবোধ্য হবে।

১। হযফ

(ক) মুযাফ (সম্বন্ধ পদ) উহ্য হওয়া।

(খ) মাউসূফ (যার দোষ–গুণ বলা হয়) উহ্য থাকা।

(গ) মূতাআল্লাকাত (সংশ্লিষ্ট-বাক্য) উহ্য থাকা।

(ঘ) এ ধরনের অন্য কিছু উহ্য থাকা।

এ সবের উদাহরণ দেখুন ঃ

[এক] আয়াত ঃ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ . . . . الخ

"কিন্তু সত্যিকারের পূণ্য হল ঈমানদার হওয়া... ইত্যাদি।" (সূরা বাকারা ১১৭)

এখানে 'মান আমানা'–এর আগে বিররু' শব্দ মাহযুফ রয়েছে। মূল বাক্যটি এই ঃ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ اٰمَنَ

[দুই] আয়াত ঃ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً...الخ

"এবং আমি সামুদ জাতিকে দৃষ্টিদায়িনী উটনী দিলাম.... ইত্যাদি।"

(সূরা বনী ঈসরাইল -৫৯)

এ আয়াতে মুব্‌সিরাতান' -এর আগে 'আয়াতান' উহ্য আছে।

সেটার সাথেই মুব্‌সিরাতান সম্পৃক্ত রয়েছে। নাকাহ্ শব্দের সাথে নয়। সুতরাং উট শাবক এখানে দেখার অধিকারী নয়, বরং অপরের চোখ খুলে দেবার সে একটা নিদর্শন মাত্র।

[তিন] আয়াত ঃ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ...الخ

"তাদের অন্তরে বাছুর-প্রীতি জন্মানো হল....ইত্যাদি।" (সূরা বাকারা -৯৩)

এ আয়াতে "আল্ ইজ্‌লা' (বাছুর) শব্দের আগে হুব্বু (ভালবাসা) শব্দ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তাদের অন্তরে বাছুর–প্রীতি দানা বেঁধেছে।

[চার] আয়াত ঃ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ..الخ

"তুমি কি হত্যা কার্যে নির্দোষ এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে...ইত্যাদি"।

(সূরা কাহাফ–৭৪)

এ আয়াতে একটি শব্দ উহ্য আছে। তা হচ্ছে 'নফস্' শব্দের আগে 'কতল' শব্দ।

[পাঁচ] আয়ত ঃ اَوْ فَسَادٍ এই আয়াতে 'ফাসাদা' শব্দের আগে ' বেগায়েরে' শব্দ। অর্থ দাঁড়ায় সে না কাউকে হত্যা করেছে, সে না কোন দুর্বিপাক সৃষ্টি করেছে। তবু তোমরা সে নিরপরাধ লোকটিকে হত্যা করলে?

[ছয়] আয়াত ঃ مَنْ فِىْ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ...الخ

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে... ইত্যাদি।"

এখানে এর অর্থ দাঁড়ায়, 'যে বস্তু আকাশে আছে এবং পৃথিবীতেও আছে'। অথচ এমন কিছু নেই যা আকাশ ও পৃথিবী দুজায়গায়ই বিদ্যমান। সুতরাং এখানে 'ওয়াল আরদে' শব্দের আগে 'ওয়া মান ফী' বাক্যাংশ উহ্য রয়েছে। তখন অর্থ হবে, 'যা কিছু, আকাশে আর যা কিছু পৃথিবীতে আছে– সবই।

[সাত] আয়াত ঃ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ..الخ

এ আয়াতে 'হায়াত' ও 'মামাত' দুশব্দের আগে 'আযাব' শব্দ উহ্য আছে। অর্থ দাঁড়াবে, 'জীবনকালের শাস্তি ও বাড়বে আর মরন কালের শাস্তিও বাড়বে।'

[আট] আয়াত ঃ وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ

"পল্লীকে জিজ্ঞেস কর। (সূরা ইউসূফ-৮২)

কিন্তু পল্লীকে তো আর জিজ্ঞেস করা চলে না। সুতরাং এখানে 'কারিয়াহ্' (পল্লী) শব্দের আগে 'আহল' (বাসিন্দা) শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ পল্লীবাসীকে জিজ্ঞেস কর।

[নয়] আয়াত ঃ

بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا... الخ

"তারা আল্লাহ্র দানকে কুফরীতে পরিবর্তিত করেছে।" (সূরা ইব্রাহমীম ২৮)

আদতে "ফায়া'লু মকানা শুকরি নি'মাতিল্লাহি কুফ্রান" হবে অর্থ দাঁড়াবে "আল্লাহ্র দানের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বদলে তারা কুফরী করেছে।

[দশ] আয়াত ঃ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ..الخ

অর্থাৎ সে বস্তুর দিকে পথ দেখায় যা বেশী উপযোগী ও উত্তম। (সূরা বনী ইসরাঈল-৯) এখানে আল্লাতী শব্দের আগে খাসলাতান শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ সেই স্বভাবের দিকে পথ দেখায় যা বেশী উপযোগী ও উত্তম।

[এগার] আয়াত ঃ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ... الخ

এখানেও আল্লাতী শব্দের আগে খাসলাতান শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ সেই স্বভাব দ্বারা যা অধিকতর ভাল। (সূরা ফুস্সিলাত-৩৪)

[বার] আয়াত ঃ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى

এখানে 'আল্ হুস্না' শব্দের আগে 'আল কালিমা' বা 'আল ই'দাতু' শব্দ উহ্য আছে। পূর্ণ বাক্যটি হবে, 'আল কালিমাতুল হুস্সুনা' বা 'আল ই'দাতু হুস্না।

[তের] আয়াত ঃ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ... الخ

এ আয়াতে 'মূলক' শব্দের আগে 'আহ্দ' শব্দ উহ্য আছে। বাক্যটি হবে 'আলা আহদে মূলকে সুলায়মান'। অর্থাৎ সুলায়মানের রাজত্বকালে।

[চৌদ্দ] আয়াত ঃ وَعَدتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ ... الخ

'তুমি নিজ রসূলদের ব্যাপারে ওয়াদা করেছ'।

এখানে 'রসূলিকা' শব্দের আগে 'আল্সেনাতে' শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ তুমি নিজ রসূলদের মাধ্যমে ওয়াদা করেছিল।

[পনের] আয়াত ঃ اِنَّآاَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ... الخ

এখানে হু সর্বনামের পূর্বে 'আল কুরআন' বিশেষ্য উহ্য আছে। কারণ আগে কোথাও বিশেষ্যের উল্লেখ নেই।

[ষোল] আয়াত ঃ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ... الخ

'এমনকি পর্দার অন্তরালে লুকাল।' (সূরা ছদ-৩২)

এখানে 'বিল হিজাব'-এর আগে 'আশ শামসু' শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ সূর্য পর্দার আড়ালে লুকাল।

[সতের] আয়াত ঃ وَمَايُلَقَّاهَا ... الخ

এ আয়াতের 'হা' সর্বনাম মূলত 'খাসলাতুস সবরে' শব্দের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

[আঠার] আয়াত ঃ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ... الخ

এখানে এর আগে 'জা'আলা মিনহুম' বাক্যাংশটি উহ্য রয়েছে।

[উনিশ] আয়াত ঃ فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَصِهْرًا ...الخ

এখানে ফাজা 'আলাহু' এর স্থলে হবে, 'ফাজা' আলা লাহু'।

[বিশ] আয়াত ঃ وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ ... الخ

'মুসা নিজ সম্প্রদায়কে বেছে নিল।' (সূরা আ'রাফ-১৫০)

এখানে 'কওমাহূ' শব্দের আগে 'মিন' অব্যয় উহ্য আছে। অর্থাৎ মুসা নিজ সম্প্রদায় থেকে কিছু লোক বেছে নিল।

[একুশ] আয়াত ঃ اَلاَ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ... الخ

"আদ সম্প্রদায় নিজ প্রভুকে অস্বীকার করল।'

এখানে 'রব্বাহুম' শব্দের আগে 'নি'মাত' শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ স্বীয় প্রভুর নিয়ামত অস্বীকার করল।

[বাইশ] আয়াত ঃ

تَفْتَؤُ এর স্থলে হবে لاتَفْتَؤُ যার অর্থ সর্বদা। (সূরা ইউসুফ৮৫)

[তেইশ] আয়াত ঃ

مَانَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلٰى اللّٰهِ زُلْفٰى

এ আয়াতে 'মা না'বুদুহুম'-এর আগে অর্থাৎ আয়াত আরম্ভের আগে 'য়্যাকূলূনা' শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ 'তারা বলত যে, আমরা প্রতিমা পূজা তো আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্যে করি।

[চব্বিশ] আয়াত ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ...الخ

'নিশ্চয়ই যারা বাছুরকে গড়ে নিল প্রভু।'

এখানে 'ইজলা' শব্দের পরে 'ইলাহান' উহ্য আছে।

[পঁচিশ] আয়াত ঃ تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ...الخ

এ আয়াতে 'আনিল 'য়্যামীন'-এর পরে উহ্য আছে, 'আনিশ শিমাল'।

অর্থাৎ ডান ও বাম উভয় দিক থেকে।

[ছাব্বিশ] আয়াত ঃ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ–

এ আয়াতে 'ইন্না লামুগরামুন-এর আগে 'তাকূলূনা' উহ্য আছে। অর্থাৎ তোমরা বলতেছ।

[সাতাশ] আয়াত ঃ لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلٰئِكَةً...الخ

"যদি আমি ইচ্ছে করতাম, তোমাদের স্থলে ফেরেশতা নিয়োগ করতাম।"

(সূরা যুখরুক ৬০)

এখানে মিনকুম' শব্দের আগে 'বাদ্লাণ' উহ্য আছে।

[আটাশ] আয়াত ঃ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ...الخ

যে ভাবে তোমার প্রভূ তোমাকে বের করে নিয়েছেন...ইত্যাদি। (সূরা আনফাল)

এখানে امض শব্দের স্থলে اخرج ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্যান্য ধরনের হজফ ঃ

বাক্যের বিভিন্ন অংশ যথা اِنَّ -এর খবর বিধেয় (কিংবা কোন শর্তের 'জাযা' ক্রিয়ার কর্ম) অথবা বাক্যের উদ্দেশ্যাংশ ইত্যদি এ শর্তে অনুল্লেখ রাখা যেন পরবর্তী শব্দ বা বাক্যাংশে সে উহ্য অংশ ধরা পড়ে। কুরআনে এর ব্যাপক অনুসরণ রয়েছে যেমন ঃ

১। আয়াত ঃ فَلَوْ شَاءَ لَهدَا كُمْ اَجْمَعِيْنَ...الخ

'যদি আমি ইচ্ছে করতাম, তোমাদের সবাইকে হিদায়াত করতে পারতাম ...ইত্যাদি।"

এখানে 'ফালাও শা-আ'র পরে 'হিদায়াতাকুম' উহ্য আছে।

২। আয়াত ঃ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

"সত্য সেটাই যা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে আসে।"

এ আয়াতের শুরুতে هذا শব্দ উহ্য আছে।

৩। আয়াত ঃ

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا-

"তোমাদের যারা মক্কা জয়ের আগে ধনপ্রাণ উৎসর্গ করেছ আর যারা পরে উৎসর্গ করেছ, দু'দল সমান হবে না।"

এ আয়াতে 'মান আনফাকা মিন কাবলিল ফাতহে ওয়া কতালা'-এর পরে 'ওয়া মান আনফাকা বা'দাল ফাতহে ওয়া কাতালা' থাকা উচিত ছিল। কিন্তু শেষভাগের উলায়ীক আ'জামু 'দারাজাতাম মিনাল্লাজীনা' বাক্যাংশে সে মর্মের প্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ জয়ের আগে যারা অর্থ দিয়েছে, যুদ্ধ করেছে আর যারা

পরে করেছে তাদের দু'দলের মর্যাদা সমান হতে পারে না।

৪। আয়াত ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَابَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِنْ اٰيَةٍ مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّاكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ-

"আর যখন তাদের বলা হয়, নিজ পরিবেশ থেকে বেঁচে চল, আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপযোগী হবে এবং যখন তাদের কাছে আল্লাহ্র কোন নিদর্শন আসতো, তারা ঘাড় ফিরিয়ে নিত।" এ আয়াত 'খালফাকুম'-এর পরে 'আ'রাযু' শব্দ মাহ্যূফ রয়েছে।

যেখানে উহ্য অংশ তালাশ নিষ্প্রয়োজন

কুরআনের আরেকটি রীতি ঠিক এর কাছাকাছি ধরনের এবং তাও স্মরণ রাখা দরকার। কিছু আয়াত আছে যা, اذ শব্দ দ্বারা শুরু হয়। যেমন ঃ

وَاِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ..الخ

"এবং যখন তোমাদের প্রভু ফেরেশতাদের বললেন...ইত্যাদি।"

কিংবা– وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى... الخ

"এবং যখন মুসা বলল...ইত্যাদি।"

এসব জায়গায় اذ অধিকরণকারক হয়ে ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু যে সব স্থানে اذ দ্বারা আকস্মিকতা বা ভীতি প্রকাশ উদ্দেশ্য হয়, তখন এ শব্দটার কৃতিত্ব এরূপ দেয়া যায় যে, কোন ভয়াবহ বা আকস্মিক ঘটনা প্রকাশের কোনরূপ বাক্যাংশ ব্যবহার না করেও একাই তা ফুটিয়ে তোলে। শুধু মাত্র "ইয্' শব্দটি ভাবনা-চিন্তাকে প্রভাবিত করে ফেলে। সুতরাং এরূপ স্থনে 'আমেল' খুঁজবার প্রয়োজন হয় না।

ان "আন্নার পর 'যার' উহ্য রাখার রীতি ব্যাপক

আরবরা সাধারণত ان ধাতুর আগে 'যের দায়ক' অব্যয়কে উহ্য করে لان এর অর্থে ব্যবহার করত। কুরআন শরীফেও কোন কোন স্থানে এ রীতিটি অনুসরণ করা হয়েছে।

কুরআনে কখনো কখনো শর্তমূলক বাক্যের শর্তোত্তর ভাগ উহ্য থাকে। যেমন ঃ

'লাও' শরতিয়ার জাবব উহ্য রাখার রীতি ও ব্যাপক ঃ

(١) وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ..الخ

"এবং তুমি যদি দেখতে যখন জালিমরা মরণের কোলে ঢলে পড়বে...ইত্যাদি।"

(ب) وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ..الخ

"যদি জালিমরা জলুমের শাস্তি দেখতে পেত!....ইত্যাদি।"

এ ধরনের আয়াতে শর্তোত্তর অংশ উহ্য থাকে। কিন্তু এ বাগধারাটি মূল অর্থে প্রকাশ না পেয়ে "বিস্ময়' প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এখানেও উহ্য অংশ তালাশের প্রয়োজন থাকে না।

২। এবদাল ঃ

এবদাল অর্থ হচ্ছে এক শব্দের স্থলে অন্য শব্দ বসানো। কুরআনে এর ব্যবহার প্রচুর। অবশ্য তার ধরন বিভিন্ন। কখনও ক্রিয়া দিয়ে ক্রিয়া, বিশেষ্য দিয়ে বিশেষ্য, অব্যয় দিয়ে অব্যয়, পূর্ণ বাক্য দিয়ে পূর্ণ বাক্য বদল করা হয়। তাছাড়া নির্দিষ্টকে অনির্দিষ্ট, পুলিংগকে স্ত্রীলিংগ, এক বচনকে বহুবচন দিয়েও পরিবর্তন করা হয়। নীচে বিস্তারিত আলোচনা দেয়া হল।

ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়া বদল ঃ

এ রীতিটা খুবই ব্যাপক। এর উদ্দেশ্য অনেক ও বিভিন্ন। কিন্তু সে সব এ বইয়ের আলোচনা নয়। কুরআনে এর ব্যবহারের উদাহরণ হচ্ছে এই ঃ

১। আয়াত ঃ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ..الخ

"এ ব্যক্তিই কি তোমাদের প্রভুদের স্মরণ করত?" (সূরা আম্বিয়া-৩৬)

এখানে يَذْكُرُ 'ক্রিয়াটি আদপে ছিল يَسُبُّ। কিন্তু 'গালি দেয়া ক্রিয়াটি মার্জিত নয় বলে স্মরণ করা' ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

এ ধরনের বর্ণনারীতির ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অহরহ ঘটে। যেমন, কারুর শরীর খারাপ হলে বলে, 'অমুকের শরীর ভাল নয়।' আবার বলে 'হযরতের আগমনে আমরা ধন্য' ও 'জনাবে ওয়ালা সব খবর রাখেন'– এ থেকে অর্থ নেয়া হয়, 'আপনি এসেছেন' ও 'আপনি তো সব জানেন।' কুরআনেও এ ধরনের বর্ণনারীতি অনুসৃত হয়েছে। যেমন ঃ

২। আয়াত ঃ وَلَاهُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ...الخ

'আমার থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।" (সূরা আম্বিয়া-৪৩)

এখানে "لَايُصْحَبُونَ" ব্যবহৃত হয়েছে। "لَايَنْصُرُونَ" - এর জায়গায়। যেহেতু সাহায্যের জন্যে সাহচর্য অপরিহার্য। তাই 'সাহচর্য' দিয়ে 'সাহায্য' শব্দ বদলে দেয়া হয়েছে।

৩। আয়াত ঃ ثَقُلَتْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ..الخ

"আসমান– যমীনে যা কিছু নিহিত আছে।" (সূরা আ'রাফ-১৮৭)

এখানে– خفيت শব্দের বদলে ثقلت ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ যে বস্তু জ্ঞান অপরিজ্ঞাত আসমান-যমীনের বাসিন্দার কাছে তা দুর্বহ বোধ হয়। তাই এ পরিবর্তন ঘটল। এটা এমনি পরিবর্তন যার ভিতরে মূল শব্দের ইংগিত বিদ্যমান।

৪। আয়াত ঃ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا

'তোমাদের প্রবৃত্তির যদি কোন বস্তু অনুকূল হয়ে থাকে।' (সূরা নিসা-৪)

আসলে ছিল ঃ

عَفَوْنَ لَكُم عَنْ شَيْءٍ مِنْ طَيِّبَةِ اَنْفُسِهِنَّ

কখনও বিশেষ্যকে বিশেষ্য দিয়ে বদলানো হয়। যেমন ঃ

১। আয়াত ঃ فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ..الخ

'ভয়ে তার সামনে তাদের মাথা নূয়ে যাবে।" (সূরা শুয়া'রা-৪)

এখানে خاضعين ব্যবহৃত হয়েছে خاضعة এর স্থলে।

২। আয়াত ঃ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ–

"এবং তারা ছিল ঈমান–আক্বীদায় পোক্ত।" (সূরা তাহ্‌রীম-১২)

মূলত এখানে স্ত্রীলিংগ কর্তা قَانِتَاتِ বিধায় হত।

৩। আয়াত ঃ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ–

'অনন্তর তাদের সহায়ক কেউ নেই।" (সূরা আল ইমরান-২২)

এ আয়াতে এক বচন ناصر হত।

৪। আয়াত ঃ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ–

'অতঃপর তোমাদের সে পথে কেউ অন্তরায় নয়।' (সূরা হাক্‌কা-৪৭)

এ আয়াতেও একবচন "حاجز" হত।

৫। আয়াত ঃ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ–

'আসরের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত।" (সূরা আছর-১/২)

এ আয়াতে গোটা আদম জাতির জন্যে একবচন الانسان। ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা জাতিবাচক বলেই হয়েছে।

৬। আয়াত ঃ

يَااَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا–

"হে মানুষ! তুমি তোমার প্রভুর দিকে প্রাণপণে এগোবার চেষ্টা করবে।"

(সূরা ইনশিকাক-৬)

এ আয়াতেও একই কারণে সমগ্র বনী আদমের স্থলে 'ইনসান' একবচনের ব্যবহার করা হয়েছে।

৭। আয়াত ঃ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ...الخ

'এবং মানুষ তা ধারণ করল।' (সূরা আহযাব-৭২)

এ আয়াতেও সেই কারণে বনী আদমের সবাইকে 'ইনসান দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

৮। আয়াত ঃ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ-

'নূহের সম্প্রদায় নবীদের মিথ্যা ঘোষণা করল।' (সূরা শুয়ারা-১০৫)

এখানে "الْمُرْسَلِيْنَ" ব্যবহৃত হয়েছে। "نُوحًا" এর স্থলে। কারণ সমগ্র নবীদের উল্লেখ থাকলেও উদ্দেশ্য শুধু হযরত নূহ (আঃ)।

৯। আয়াত ঃ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ

নিশ্চয় আমিই তোমাকে বিজয় দান করেছি। (সূরা ফাতাহ-১)

এখানে ফাতাহতু এক বচন উচিত ছিল। অথচ বহুবচন ব্যাবহারিত হয়েছে।

১০। আয়াত ঃ اِنَّا لَقَادِرُوْنَ-

'নিশ্চয়ই আমি ক্ষমতাবান। (সূরা মায়ারিজ-৪০)

এখানে "اِنِّىْ لَقَادِرٌ" -একবচনের স্থলে বহুবচন ব্যাবহারিত হয়েছে।

১১। আয়াত ঃ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ

এবং আল্লাহ্ তাঁর রসূলদের জয়ী করেন।' (সূরা হাশর-৬)

এখানেও বহুবচণে 'রসূলগণ' ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ মর্ম নেয়া হয়েছে শুধু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)।

১২। আয়াত ঃ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ-

'যাদের উদ্দেশ্যে সবাই বলল।' (সূরা আল ইমরান-১৭৩)

এখানে "النَّاس" শব্দটি 'উরুয়াহ সাকাফী'র বদলে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩। আয়াত ঃ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ-

'তাই আল্লাহ্ তাকে ক্ষুধার পোশাকের মজা দেখালেন।' (সূরা নাহল-১১২)

এ আয়াতেও "لباس" আসলে "طعام" শব্দের বদলে এসেছে। এর কারণ হচ্ছে, দুটোর ভেতরে বিশেষ ধরনের ঐক্য রয়েছে। অর্থাৎ ক্ষুধাও দেহকে দুর্বল করে সারা দেহে পোশাকের মত জড়িয়ে থাকে।

১৪। আয়াত ঃ صِبْغَةَ اللّٰهِ

'আল্লাহ্র রঙ'। (সূরা বাকারা -১৩৮)

এখানে 'দীন'—এর স্থলে 'সিবগাহ্' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি কারণ রয়েছে তা এই, কাপড়ে যেরূপ রং লাগে, তেমনি অন্তরে ধর্মের রং লাগে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ঈসায়ীদের বিশেষ পরিভাষার সাথে সংযোগ স্থাপন।

১৫। আয়াত ঃ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ–

এখানে سينا একবচনের স্থলে সীনীন বহুবচন ব্যাবহার হয়েছে।

১৬। আয়াত ঃ سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ–

এই আয়াতে ইলিয়াস-এর স্থলে 'ইল্য়াসীন' ব্যবহৃত হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে 'মুবাদ্দাল ও মুবাদ্দাল মিনহু"-এর ভেতরে সামঞ্জস্য বিধান। দ্বিতীয়ত, এর ফলে বর্ণনায় গতির সৃষ্টি হয়েছে।

অব্যয় দ্বারা অব্যয় বদল ঃ

যেমন ঃ

১। আয়াত ঃ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ–

'তারপর যখন তার প্রভূ পাহাড়টি আলোকোজ্জ্বল করলেন।" (সূরা আ'রাফ-১৪৩)

এ আয়াত "جبل" এর সংগে (ل.) যের্দায়ক অব্যয় এসেছে। আর তা على অব্যয়ের পরিবর্তে এসেছে। অর্থাৎ যেভাবে প্রথম গাছের ওপরে জ্যোতির বিকাশ ঘটেছিল।

২। আয়াত ঃ هُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ

'তারা সেদিকে এগিয়ে গেল।' (সূরা মুমিনূন-৬১)

এ আয়াতলها এসেছে اَلَيْهَا। এর বদলে।

৩। আয়াত ঃ لَايَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ اِلَّامَنْ ظَلَمَ

'আমার কাছে রসূলদের কোন ভয় নেই—একমাত্র আত্মপীড়ক ছাড়া।' (সূরা নমল ১০/১১)

এ আয়াতে لاَّ এসেছে। لَكِنَّ -এর পরিবর্তে।

৪। আয়াত ঃ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُزُوْعِ النَّخْلِ–

'আমি অবশ্যই তোমাদের খেজুর শাখায় ফাঁসি দেব।' (সূরা ত্ব'হা-৭১)

আয়াতে على এর স্থলে فى ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। আয়াত ঃ – أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ

'তাদের কাছে কি সিঁড়ি আছে যাতে চড়ে তারা শুনতে পায়?' (সূরা তুর-৩৮)

এ আয়াতে "عليه" এর স্থলে "فيه" ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। আয়াত ঃ اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ–

'আকাশ তার ফলে বিদীর্ণ হবে।' (সূরা মুজ্জামিল -১৮)

এ আয়াতে فيه এর স্থলে به ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। আয়াত ঃ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ .... الخ

'তা নিয়ে অহংকার করে।' (সূরা মুমিনুন-৬৭)

এ আয়াতে عنه এর স্থলে به ব্যবহৃত হয়েছে।

৮। আয়াত ঃ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ –

'মর্যাদাবোধই তাদের পাপে লিপ্ত করল।' (সূরা বাকারা ২০৬)

এখানে حملته স্থলে اخذته এবং على এর স্থলে با ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হবে, মর্যাদা ও ক্ষমতা তাকে পাপের দিকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৯। আয়াত ঃ فَاسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا–

এ ব্যাপারে কোন পরিজ্ঞাত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।' (সূরা ফুরকান-৫৯)

এখানেও عنه এর স্থলে به এসেছে।

১০। আয়াত ঃ لَاتَا كُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ–

'নিজের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ খেয়ে বসবে না।' (সূরা নিসা-২)

এখানে ও مع এর স্থলে الٰى এসেছে।

১১। আয়াত ঃ مَعَ الْمَرَا فِق মূলে ছিলঃ اِلٰى الْمَرَا فِق–

অর্থ দাঁড়াবে, কনুইসহ। (সূরা মায়েদা-৬)

১২। আয়াত ঃ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ–

আল্লাহ্‌র বান্দা তা থেকে পানি পান করে।' (সূরা দাহার-৬)

মূলত হতঃ يَشْرَبُ مِنْهَا عِبَادُاللّٰهِ

'আল্লাহ্‌র বান্দা তা থেকে পানি পান করে।'

১৩। আয়াত ঃ

مَاقَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَااَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِنْ شَىْءٍ–

'যখন তারা বলে, আল্লাহ্‌ মানুষের কাছে কিছুই অবতীর্ণ করেন নি; তখন তারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না।' (সূরা আনাম-৯১)

এ আয়াতে اذ এসেছে ان অব্যয়ের বদলে।

বাক্যের বদলে বাক্য ব্যবহার ঃ

কখনও পূর্ণ একটা বাক্য অনুল্লেখ রেখে তার বদলে আরেকটি বাক্য ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বাক্য যদি পয়লা বাক্যের মর্ম ব্যক্ত করে ও তার অস্তিত্বের আভাস দেয়, তা হলেই এরূপ করা হয়। এতে মর্ম তো যথাযথ থাকে, কিন্তু বাক্যের কাঠামো সংক্ষেপ করে। যেমন ঃ

১। আয়াত ঃ وَاِنْ تُخَا لِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ–

'তোমরা যদি তাদের সাথে মিশ, তাহলে তারা তোমাদের ভাই হয়ে যাবে। (সূরা বাকারা-২২০)

আদতে বাক্যটি ছিল এই ঃ

نْ تُخَا لِطُوْ هُمْ لَابَاْسَ بِذٰلِكَ لِاَنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ وَشَانُ الْاَخِ اَنْ يُخَالِطَ اَخَاهُ–

২। আয়াত ঃ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ...الخ

"আল্লাহ্‌র থেকে প্রাপ্ত পুরস্কার অবশ্যই এর চেয়ে উত্তম।" (সূরা বাকার-১০৩)

বাক্যটি এরূপ হতঃ لَوَجَدُوا ثَوَابًا وَمَثُوبَةٌ عِنْدَاللّٰهِ خَيْرٌ–

৩। আয়াত ঃ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ–

'যদি সে চুরি করে থাকে, তাহলে এর আগে তার ভাইও চুরি করেছে।'

(সূরা ইউসুফ-৭৭)

বাক্যটি এরূপ ছিল ঃ

إِنْ سَرَقَ فَلَا عَجَبَ، لِأَنَّهُ قَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ–

'সে যদি চুরি করে থাকে, অবাক হবার কিছু নেই। কারণ তার ভাইও চোর।'

৪। আয়াত ঃ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ

'যদি কেউ জিবরাঈলকে দুশমন ভাবে, তার মনে রাখা উচিত, আল্লাহ্‌ই তাকে তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করেছেন।' (সূরা বাকারা-৯৭)

বাক্যটির মূল রূপ ঃ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لَهُ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِهِ فَعَدُوُّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعَادِيَهِ اللّٰهُ تَعَالَى–

'যে ব্যক্তি জিব্রাঈলের শত্রু, সে আল্লাহ্‌র শত্রু। কারণ তিনিই তাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। সুতরাং তার সাথে যে শত্রুতা করে সে আল্লাহ্‌র শত্রুতাই কামনা করে।'

অনির্দিষ্ট শব্দকে নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা পরিবর্তন ঃ

কখনও বাগধারা চায় যে, অনির্দিষ্ট শব্দকে নির্দিষ্ট করে ব্যবহার করা হোক। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্টতার চিহ্ন ও রীতি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মর্ম অনির্দিষ্টই থাকে। যেমন ঃ

১। وَقِيْلِهِ يَارَبِّ এখানে قيله আসলে قيل له ছিল। এ পরিবর্তনে বাক্যের সংকোচন ঘটেছে।

২। حَقُّ الْيَقِيْنُ আসলে حق. يقين ছিল। কিন্তু "ل" যোগ করা হয়েছে, শুধু উচ্চারণের সুবিধার জন্যে।

লিংগ ও বচনের পরিবর্তন ঃ

কখনও বাগধারার স্বাভাবিক চাহিদা মোতাবেক সর্বনাম স্ত্রীলিংগ, কখনও বা পুংলিংগ করা হয়। কখনও তাতে একবচন ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়, কখনও আবার এক বচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহার দরকার হয়। এ পরিবর্তনের মূলে রয়েছে বাক্যে মূল অর্থের সংগতি বিধান। যেমন ঃ

১। আয়াত ঃ

فَلَمَّا رَاٰىءَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّى هٰذَا اَكْبَرُ–

'যখন সূর্যকে চমকাতে দেখল, বলল এই আমার সেই শ্রেষ্ঠ প্রভু।'

(সূরা আনয়াম-৭৮)

এ আয়াতে 'শামস্' পুংলিংগের স্থলে 'বাযিগাতান' এ সর্বনাম স্ত্রীলিংগ ব্যবহৃত হয়েছে।

২। আয়াত ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْ قَدَنَاراً فَلَمَّا اَضَاءَ تْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ

'তাদের উপমা এই, যেন একদল আগুন জ্বালাল আর যখনই চারিদিক আলোকিত হল, আল্লাহ্ তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করলেন।' (সূরা বাকারা-১৭)

এ আয়াতে 'আদাআত' এ সর্বনাম বহুবচনের স্থলে এক বচন ব্যবহৃত হয়েছে।

এভাবে কখনও দ্বিবচনের জায়গায় একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ঃ

১। আয়াত ঃ

وَمَانَقَمُوْا اِلَّااَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهٖ–

এ আয়াতে غنى। ক্রিয়াটি একবচন। অথচ তার কর্তা আল্লাহ্ ও রসূল দু'জন। ঠিক فضله এর সর্বনামের ও সেই অবস্থা যেহেতু আল্লাহ্ ও রসূলের একই করণীয় ব্যাপার, তাই দ্বিবচনের জায়গায় একবচন নেয়া হয়েছে।

২। আয়াত ঃ

اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّيْ وَاٰتَانِيْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ-

'যদি আমি আমার প্রভুর থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন পেয়ে থাকি এবং তাঁর থেকে রহমতও লাভ করি....ইত্যাদি।' (সূরা হুদ-২৮)

এখানে عميت এর সম্পর্ক بينة ও رحمة দুটোরই সাথে। সুতরাং দ্বিবচনের عميتا হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুটোরই অবস্থা এক বলে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

বাক্যাংশেরর পরিবর্তন

বাগধারার চাহিদা অনুসারে কখনও শর্তমূলক ও প্রতিজ্ঞাবাচক বাক্যের শর্ত ভাগ ও প্রতিজ্ঞা ভাগ এবং জবাবের অংশ যথাযথই থাকা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রেও একটি অংশ স্বতন্ত্র বাক্য করে নেয়া হয়। কারণ এ পরিবর্তন মর্মের সাথে সংযোগ রেখেই করা হয়। অবশ্য তাতে এরূপ কোন চিহ্ন থাকা চাই, যা কোন না কোনভাবে সে পরিবর্তনের ইংগিত দান করে। যেমন ঃ

১। আয়াত ঃ

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ

'কঠোরভাবে গ্রেফতারকারী সেই ফিরিশতাদের শপথ! যারা প্রাণকে বাঁধন মুক্ত করে ও তা নিয়ে বায়ু পথে সবার আগে দ্রুত চলে এবং বিভিন্ন কাজের তত্ত্বাবধান করে। যেদিন কাঁপন-সৃষ্টিকারী কাঁপিয়ে তুলবে।' (সূরা নাযিআত-১–৬)

এ আয়াতে আগা-গোড়া শপথ নেয়া হয়েছে। অথচ শপথোত্তর বক্তব্যের উল্লেখ নেই। তা হচ্ছে 'হাশর-নশর' সত্য। কিন্তু তার বদলে বলা হল, 'ইয়াওমা তারজুফুর রাজিফাহ্' এবং এ বাক্যটিই মূল বক্তব্য ব্যক্ত করেছে।

২। আয়াত ঃ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُوْدٍ
قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ-

'কক্ষ পথবিশিষ্ট আকাশের শপথ! অংগীকৃত দিনের শপথ! দর্শক ও দৃষ্টদেরর শপথ! অগ্নিকুন্ডের মালিকরা নিহত হয়েছে।' (সূরা বুরুজ-১-৪)

এ আয়াতেরও শপথোত্তর বক্তব্য নেই। তা হচ্ছে, কর্মফল সত্য।

৩। আয়াত ঃ

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ
وَاَلْقَـــتْ مَافِيْهَا وَتَـخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا اَيُّهَا
الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ-

'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে তার প্রভুর আদেশে এবং এটাই তার হবার। যখন পৃথিবী সমতল ভূমি করা হবে ও তার ভেতরের সবকিছু বেরিয়ে আসবে তার প্রভুর আদেশে এবং এটাই তার হবার। হে মানব! নিশ্চয়ই তুমি কঠোর সাধনা করবে।' (সূরা ইনশিকাক-১-৬)

এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, কর্মফল দান ও হিসাব নিকাশ গ্রহণ সত্য। এখানেও শুধু শর্ত বলে যাওয়া হয়েছে। তার উত্তরে কিছু বলা হয়নি।

বর্ণনা রীতি বদল ঃ

কখনও বাক্যের বর্ণনারীতির বদল হয়ে থাকে। বাক্য হয়ত চায় মধ্যম পুরুষে বক্তব্য পেশ হওয়া। সেখানে হয়ত তৃতীয় পুরুষে বক্তব্য পেশ করা হয়। যেমন ঃ

আয়াত ঃ حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ

'এমনকি তোমরা যখন কিশতীতে থাক এবং সেগুলো মৃদু মলয়ের সাহায্যে ভেসে চলে।' (সূরা ইউনুস-২২)

এখানে كنتم -এ মধ্যম পুরুষে বহুবচন। সে চায় পূর্ণ বাক্য এ ঢঙে হবে। কিন্তু রীতি বদল হল। তৃতীয় পুরুস করে جرين শব্দ ব্যবহার করা হল।

এভাবে কখনো বাক্য রীতি পরিবর্তিত করে 'ইনশা'কে খবর ও খবরকে ইনশা করা হয়। তেমনি ক্রিয়া দ্বারা আবদ্ধ বাক্য ইন্শা বাক্যে ও ইনশা- বাক্য ক্রিয়াভিত্তিক বাক্যে পরিবর্তিত করা হয়। যেমন ঃ

১। আয়াত ঃ فَامْشُوْا فِىْ مَنَا كِبِهَا-

এখানে নির্দেশক পদ যা ইনশা বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। অথচ মর্মের দিক থেকে এটা ছিল ক্রিয়া আরদ্ধ বাক্য। উক্ত পদের রূপ ছিল। "لتمشوا" যা ঘটমান ক্রিয়া ছিল। (সূরা মুলক-১৫)

২। আয়াত ঃ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْ مِنِيْنَ-

'যদি তোমরা ঈমানদার হও।' (সূরা বাকারা ৯৩)

এখানে শর্তসূচক শব্দ দিয়ে বাক্য শুরু হওয়ায় এটাও ইনশা–বাক্য হল। অথচ মূল বাক্য খবর বাক্য বা ক্রিয়া-আরব্ধ বাক্য। তা হচ্ছে ঃ

اِيْمَانُكُمْ يَقْتَضِىْ هٰذا-

অর্থাৎঃ তোমাদের ঈমানের এটাই চাহিদা।

৩। আয়াত ঃ

مِنْ اَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَا ئِيْلَ-

'এই কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের ওপরে ফরয করেছি।' (সূরা মায়েদা-৩২)

বাক্যটি ছিল এই, 'বনী আদমের অবস্থার ওপরে ভিত্তি করে কিংবা সেই উদাহরণ অনুসারে আমি বনী ইসরাঈলের ওপরে এটা ফরয করেছি।' অথচ 'বনী আদমের অবস্থার ওপরে ভিত্তি করে কিংবা বনী আদমের অবস্থার উদাহরণ অনুসারে' -এ বাক্যাংশটি 'এই কারণে' (মিন্ আজালে যালিক) বাক্যাংশ দ্বারা পরিবর্তন করা হল। সাধারণত কিয়াস কোন কারণকে ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। বললে কেবল বিশ্লেষণ দেয়া হয় মাত্র। তা থেকে বেঁচে বাক্য সংকোচনের জন্যে এরূপ করা হয়েছে।

৪। اَرَئَيْتَ এটা প্রশ্নসূচক পদ। 'দেখা শব্দ থেকে গড়া হয়েছে। কিন্তু এখানে সতর্ক করার জন্যে প্রশ্নসূচক পদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পরবর্তী বাক্যের প্রতি মন আকর্ষণ করার জন্যে এরূপ করা হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এরূপ বলে থাকি। যেমন ঃ আপনি দেখেছেন কি? শুনেছেন কি?

বাক্যাংশের আগ্ পিছ করা ঃ

কখনও বাক্যের গাঁথুনীতে বাক্যাংশের আগের অংশ পেছনে ও পেছনের অংশ আগে আনা-নেয়া করা হয়। ফলে মূল অর্থ বুঝা দায় হয়। নীচের বিখ্যাত দুটা আরবী চরণ থেকে তা বুঝা যা যাবে ঃ

بُثَيْنَةُ شَأنُهَا سَلبتْ فُؤَادِيْ

بِلَا جُرْمٍ اَتَيتُ بِهِ سَلاماً–

দুর অব্যায় ঃ

কখনও শব্দের সম্পর্ক দূরবর্তী কোন শব্দ কিংবা ভাবের সাথে সংযুক্ত হয়। সে কারণেও বাক্যটি দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে।

এ ধরনের আরও অবস্থা রয়েছে অনেক। যার ফলে আয়াতের মর্ম বুঝা কঠিন হয়ে থাকে। যেমন ধারাবাহিক 'ইল্লা' (ব্যতীত) ব্যবহার।

১। আয়াত ঃ

اِلاَّ اٰلَ لُوطٍ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلاَّ امْرَأَتَهُ–

'লূত পরিবার ব্যতীত আমরা সবাইকে মুক্তি দিয়েছি, তাঁর স্ত্রী ব্যতীত।'

(সূরা হিজ্‌র-৫৯)

এখানে এস্তেসনার পর আর এক এস্তেসনা প্রবেশের কারণে অর্থ দুবদ্ধ হয়েছে।

২। আয়াত ঃ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِا لدِّيْنِ–

'এর পরেও কোন বস্তু তোমাকে পরকালে অবিশ্বাসী করেছে? (সূরা ত্বীন-৭)

এ আয়াতের একেবারেই সংলগ্ন রয়েছে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষকে সুন্দর কাঠামোতে গড়েছেন।' (সূরা তীন-৪)

অথচ এ দু'আয়াতের অর্থে বাহ্যত কোনই মিল নেই। তাই দুর্বোধ্য হয়েছে।

৩। আয়াত ঃ يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ–

অর্থ দাঁড়াল, তার জন্যে ডাকছে যার ক্ষতিটা কল্যাণের চাইতে কাছাকাছি হয়েছে। আদতে মর্ম এই তাকেই ডাকছে, যার মংগলের চাইতে অমংগলটাই নিকটবর্তী। এখানে من শব্দের বদলে لمن আসায় মর্মোদ্ধারে অসুবিধে দেখা দিয়েছে। (সূরা হজ্জ-১৩)

৪। আয়াত ঃ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ

আয়াতের মূলরূপ ছিল ঃ لتنؤ العصبة بها–

কিন্তু বর্ণনাভংগী বদলে যাওয়ায় শব্দেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, এ কারণেই অর্থ দুর্বোধ্য হয়েছে। (সূরা কাছাছ-২৬)

৫। আয়াত ঃ وَامْسَحُوْا بِرُءُ وسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ–

'এবং তোমাদের মাথা মুছ ও তোমাদের চরণগুলো ....। এর শেষভাগে হবার ছিলঃ واغسلوا ارجلكم

এখানে দূর– অব্যয় ঘটিত দুর্বোধ্যতা দেখা দিয়েছে। (সূরা মায়েদা-৬)

৬। আয়াত ঃ

لَولَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَاَجَلٌ مُّسَمًّى

"যদি তোমাদের ভাগ্য আগে নির্ধারিত না হত ও নির্দিষ্ট মুহূর্ত, তা হলে পাকড়াও হতে।" (সূরা ত্বহা-১২৯)

এখানে হওয়া প্রয়োজন ছিল ঃ

ولولاكلمة سبقت واجل مسمى لكان لزاما–

বাক–বিন্যাসের ব্যতিক্রমে এ দুর্বোধ্যতা এল।

৭। আয়াত ঃ اِلَّاتَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ–

"তা না করলে তোমরা বিপদে পড়বে।" (সূরা আনফাল-৭৩)

এর সংগেই– فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ–

"অতঃপর তোমাদের ওপরে সাহায্য অপরিহার্য।" (সূরা আনফাল-৭২)

আসায় পারস্পরিক সম্পর্কের অভাবে দুর্বোধ্যতা দেখা দিয়েছে।

৮। আয়াত ঃ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ–

"ইব্রাহীমের বাক্য ছাড়া।" (সূরা মুমতাহিনা-৪)

এই আয়াতটির সংশ্লিষ্ট আয়াত হল ঃ

لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيمَ–

"ইব্রাহীমের ভেতরে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

এ দুয়ের ঐক্য অস্পষ্ট বলেই দুর্বোধ্যতা দেখা দিয়েছে।

৯। আয়াত ঃ يَسْئَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا–

(সূরা আ'রাফ-১৮৭)

এ আয়াতে বাক-বিন্যাসের ব্যতিক্রমের জন্যে দুর্বোধ্যতা এসেছে। আয়াতে 'আনহা' -এর স্থান ছিল 'য়্যাসয়ালূনাকা' -এর পরেই। কিন্তু বাক্যে عنها 'হাফিয়ান' -এর পরে আসায় শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে অসুবিধে হয়েছে বলেই এ দুর্বোধ্যতা দেখা দিল।"

আয়াতটির রূপ হত এই ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنْهَا كَأَنَّكَ حَفِيٌّ–

বাক্যের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দের কারণে ঃ

কখনও বাগধারা বা বাক্য- বিন্যাসের ব্যতিক্রম ছাড়া আরও কয়েকটি কারণে আয়াতের দুর্বোধ্যতা দেখা দেয়। যেমন ঃ

১। (ছিফাত) বিশেষণ ব্যবহারের ফলে–

(ক) আয়াত ঃ وَلَاطَائِرٍيَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ–

আর এমন পাখী নেই যা দু'ডানায় ভর দিয়ে উড়ে না। (সূরা আনআম-৩৮)

(খ) আয়াত ঃ

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا-

"নিশ্চয়ই মানুষকে কোমলমতি গড়া হয়েছে। দুর্বিপাকে পড়লে তারা ভেংগে পড়ে ও সুখে থাকলে তারা মেতে ওঠে।" (সূরা মাআরিজ-১৯-২১)

২। কোন বাক্যাংশের (বদল) পুনরুক্তির ফলে-

لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ-

তাদের জন্যে যাদের দুর্বল ভাবা হল, তাদের জন্যে যারা ঈমান আনল।

(সূরা আ'রাফ -৭৫)

৩। কখনও আতফে তফসিরী যৌগিক বাক্যের একটি অপরটির ব্যাখ্যা হলেঃ حَتّٰى إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً-

এমনকি যখন পূর্ণবয়স্ক হল এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছল। (সূরা আহকাফ-১৫)

৪। কোন অক্ষর তাকরার বা শব্দের পুনরুল্লেখ ঘটলে-

(ক) আয়াত ঃ

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ

যারা অনুসরণ করে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য অংশীদার, তারা যা অনুসরণ করে, তা অনুমান ছাড়া আর কিছুরই অনুসরণ নয়। (সূরা ইউনুস -৬৬)

বাক্যের মুলরূপ এই ঃ

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ اِلَّا الظَّنَّ

(খ) আয়াত ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَاعَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ-

"এবং যখন তাদের কাছে তাদের গ্রন্থকে স্বীকৃতিদানকারী গ্রন্থ এল, অথচ এর আগে তারা কাফিরদের ওপরে তার সাহায্যেই প্রাধান্য বিস্তার করত, আর সেটাই যখন এল, তখন চিনতে পারল না এবং তা অস্বীকার করে বসল।"

(সূরা বাকারা ৮৯)

এ আআতে لما جاء এর পুনরাবৃত্তি ঘটায় অর্থ দুর্বোধ্য হয়েছে।

(গ) আয়াত ঃ

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ

'এবং তাদের ভয় করা উচিত আল্লহ্কে যারা ভয় পায় নাবালেগ সন্তানদের ছেড়ে মরতে এই ভেবে যে, তাদের পরে কি উপায় হবে? অতএব তাদের আল্লাহকেই ভয় করা উচিত। (সূরা নিসা-৯)

এখানেও 'আল্লাহ্-ভীতি' দুবার উল্লেখ করারয় মর্ম অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫। আয়াত ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

তোমাকে নব চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে? বলে দাও, তা হচ্ছে মানুষের জন্যে সময় নির্ধারক ও হজ্জের সময়– নির্দেশক। (সূরা বাকারা ১৮৯)

এখানে সংক্ষেপে হত ঃ

هى موا قيت للناس فى الحج–

"নব চাঁদ মানুষে জন্যে তাদের হজ্জের সময় নির্দেশক।" কিন্তু والحج বলায় একটু বাড়লেও লাভ হয়েছে বেশী। মানে, 'চাঁদ তো শুধু হজ্জের সময় নির্দেশের জন্যেই নয়; মানুষের পঞ্জিকা ঠিক করার জন্যে।"

৬। আয়াত ঃ

لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ

"মক্কাবাসী ও তার পার্শ্ব বর্তীদের যেন সতর্ক কর এবং সতর্ক কর কিয়ামতের দিন সম্পর্কে।" (সূরা শূরা-৭)

মূলরূপ হবে ঃ تنذر ام القرى يوم الجمع

এখানে দু'বার تنذر এসে গোলমাল বাধিয়েছে।

৭। আয়াত ঃ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً–

"তুমি পাহাড় দেখবে তো সুসংবদ্ধ বলেই মনে করবে।" (সূরা নামাল - ৮৮)

এখানে تحسبها অতিরিক্ত। ترى -এর বিভিন্ন মর্মের ভেতরে এখানে حسبان বুঝাবার জন্যে এসেছে। আর তার ফলে বাক্য জটিল হয়েছে।

৮। আয়াত ঃ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِمَا جَائَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ–

"মানুষ এক জাতিই ছিল। তারপর আল্লাহ্ তাদের সুসংবাদ ও দুঃসংবাদ দানের জন্যে নবীদের পাঠালেন এবং তাদের সাথে সত্য গ্রন্থ পাঠালেন যেন তা দিয়ে মানুষের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসা করা হয়। এর বিরুদ্ধে কেউ আপত্তি তোলেনি। শুধু পূর্ব গ্রন্থানুসারীরা, তাও নতুন গ্রন্থ অবতীর্ণ হবার পরে কেবল জিদের বশবর্তী হয়ে বিরোধী সেজেছে। আল্লাহ্ যাদের চান সরল পথ দেখিয়ে দেন।" (সূরা বাকারা-২১৩)

ওপরের আয়াতটির প্রতিটি বাক্য সুবিন্যাস্ত ও সুসংবদ্ধ। তথাপি মাঝখানে وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ أُوْتُوْ বাক্যাংশটি জুড়ে দেয়া হয়েছে এ

জন্যে যে, اَخْتَلَفُوْ فِيْهِ। فِيْمَا অংশটির সর্বনামটি সুস্পষ্ট হোক। অর্থাৎ এ কথাটা পরিস্কার হোক যে, পূর্বের ঐশীগ্রন্থ প্রাপ্তদের ভেতরকার যে অনৈক্য ও মতভেদের কথা বলা হয়েছে, গ্রন্থ হাতে পেয়েই তারা এসব মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে। তারা গ্রন্থের কিছু হুকুম মেনেছে, আর কিছু অস্বীকার করেছে।

বাক্যের মধ্যে হরফে যর বাড়ানর কারণে ঃ

কুরআন কোথাও কর্তা বা কর্মের সাথে যেরদায়ক হরফ ব্যবহার করে তাকে ক্রিয়া- প্রভাবক করে নিয়েছে। তাতে সংযোগ ও অনুসরণ অর্থ জোরদার হয়েছে। যেমন ঃ

১। আয়াত ঃ يَوْمَ يُحْمٰي عَلَيْهَا

আদতে হত ঃ تحمى هى

২। আয়াত ঃ

وَقَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسٰى بْنِ مَرْيَمَ

'এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের জন্যে আমি ঈসা ইবনে মরিয়মকে পেছনে পাঠিয়েছি। (সূরা মায়েদা-৪৬)

আদতে হত ঃ قفينا هم بعيسى بن مريم–

'তাদের পরে আমি ঈসাকে পাঠিয়েছ।'

"ওয়ায়ে" এতে সাল অতিরিক্ত হওয়ার কারণে ঃ

এখানে আরেকটি রহস্য খুলে ধরা প্রয়োজন। তা এই "و" অক্ষরটি সাধারণত দুবাক্যে সংযোগ সাধনের কাজ দেয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণকে জোরদার করার কাজেও লাগে। যেমন ঃ

(ক) আয়াত ঃ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ হইতে

(খ) আয়াত ঃ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً পর্যন্ত

(গ) আয়াত ঃ حَتّٰى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا

(ঘ) আয়াত ঃ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

"ফা"-এ এত্তেসাল" বাড়ার কারণে

এভাবে কোথাও 'ফা' ব্যবহৃত হয়। তার স্বতন্ত্র অর্থ থাকে না। কেবল বাক্যের সৌন্দর্য বাড়ায়।

আল্লামা কুস্তালানী কিতাবুল হজ্জের ব্যাখ্যায় যেখানে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন যে, উমরার নিয়্যত বেঁধে যদি উমরা সেরে মক্কা ছেড়ে চলে, তখন বিদায়ী তাওয়াফ জরুরী কী না, সেখানে প্রসংগত লিখেছেন "যদি সিফাত ও মওসূফের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করা উদ্দেশ্য হয়, তা হলে এদুয়ের মাঝে সংযোজক অব্যয় ব্যবহার বৈধ। যেমন ঃ

আয়াতঃ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ-

যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলে। (সূরা আনফাল ৪৯)

এখানে মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ আছে, একই মানুষ-সিফাত ও মওসূফ। শুধু বাক্যে জোর সৃষ্টি করার জন্যে "و" ব্যবহার করা হয়েছে।

বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ সিব্ওয়াই এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছে, এ আয়াত ঠিক নিম্নের বাক্যটির মত ঃ

مررت بزيد وصاحبك-

'আমি যায়েদ ও তোমার বন্ধুর সাথে গিয়াছিলাম।'

যদি এখানে তোমার বন্ধু বলতে যায়েদ হয়, তা হলে 'যায়েদ' মওসূফ 'সাহেবেকা' সিফাত হবে। অথচ দুয়ের মাঝে রয়েছে সংযোজক অব্যয়।

আল্লামা যমখ্শরী নিম্নের আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ-

'এমন কোন জনপদ আমি ধ্বংস করিনি, যার বাসিন্দাদের বিশেষ গ্রন্থ ছিল না।' (সূরা হিজ্‌র-৪)

এখানে ولهاكتاب معلوم সিফাত এবং قرية মওসূফ দুয়ের মাঝে সংযোজক অব্যায় শুধু সিফাতে জোর সৃষ্টির জন্যে এসেছে। নীচের আয়াতে ঠিক এ রীতিই অনুসৃত হয়েছে।

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ-

'এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি, যার জন্যে সতর্ককারী ছিল না।'

(সূরা শুরা-২০৮)

এখানে অব্যয়টি সিফাত ও মওসূফের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে এসেছে এখানেও সিফাতে জোর দেয়া উদ্দেশ্য। এ আয়াতটি নীচের বাক্যটির মতই ঃ

جاءنى زيد وعليه ثوب- এর স্থলে

'যায়েদ এসেছে এবং তার দেহে পোশাক।'

বাক্যের দুটি অংশের ভেতরে সংযোজক অব্যয় নাম মাত্র রয়েছে। অর্থে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। এখানে অব্যয় ছাড়াই চলত।

বিক্ষিপ্ত সর্বনাম ঃ

কখনও সর্বনাম নির্দিষ্ট করার অসুবিধার জন্যে আয়াত দূর্বোধ্য হয়। কখনও একই শব্দ দুটি অর্থ প্রকাশ করায়ও অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন ঃ

১। আয়াত ঃ

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ

'এবং নিশ্চয়ই তারা তাদের সঠিক পথ থেকে বিরত রাখে, আর তারা ভাবে যে, তারাই সুপথপ্রাপ্ত। (সূরা যুখরুফ-৩৭)

এ আয়াতে তিন সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। তিনটিই অনির্দিষ্ট। তাই সরল পথ থেকে কারা ফিরায়, আর ভ্রান্ত পথে চলেও কারা নিজদের সঠিক ভাবছে, তা বুঝা যায় না। যদি সর্বনাম নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, তাহলে আয়াত এরূপ দাঁড়ায় ঃ

إِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيَصُدُّوْنَ النَّاسَ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُ
النَّاسُ أَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ

'নিশ্চয়ই শয়তানরা মানুষকে সুপথ থেকে ফিরায় এবং মানুষ ভাবে যে, তারা অবশ্যই সঠিক পথে চলেছে।'

এবং قَالَ قَرِيْنُهُ এ এক স্থানে অর্থ হচ্ছে শয়তান, অন্যখানে অর্থ হচ্ছে ফেরেশ্‌তা।

২। আয়াত ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَايُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ-

'তারা কাকে দান করবে তা তোমাকে প্রশ্ন করছে? বল, যা দান করবে তাই ভাল।' (সূরা বাকারা -২১৫)

৩। আয়াত ঃ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَايُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ-

'তারা কি দান করবে তা তোমাকে প্রশ্ন করছে? বল, যা বেশী, তাই দান করবে।' (সূরা বাকারা ২১৯)

পয়লা আয়াতে জবাব এ জন্যে সঠিক হয়েছে যে, তারা দানের পাত্র খুজেছে। তাই বলা হল 'দান যেখানে যা-ই করুক উত্তম।' অথচ দ্বিতীয় আয়াতে জবাবের ধরনে বুঝা যায়, দানের পরিমাণ জানতে চেয়েছে। সুতরাং তাদের জন্যে এ জবাবেই সঠিক হল যে, 'উদ্বৃত্ত সম্পদ দান করবে।'

এভাবে কখনও "جعل" এবং "شئ" এই জাতীয় বিভিন্ন শব্দের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আলাদা আলাদা অর্থ প্রকাশের ফলেও আয়াত দুর্বোধ্য হয়। যেমন ঃ

(ক) جعل শব্দেকে خلق অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন- جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, আঁধার ও আলো।

(সূরা আনয়াম-১)

(খ) কখনও তা عتقد। অর্থাৎ আকীদা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاءَ

'আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের আকীদা এই যে, তিনিও তাদের দেখা কোন বস্তুর মতই কিছু।' (সূরা আনয়াম-১৩৬)

'এভাবে شئ শব্দকে কখনও কর্তা, কখনও কর্ম ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন ঃ

১। আয়াত ঃ اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْئٍ

অর্থাৎ তারা কি কোন কিছু ছাড়া এমনিই সৃষ্টি হয়েছে? (সূরা তূর-৩৫)

এখানে شئ দ্বারা خالق অর্থাৎ স্রষ্টা অর্থ নেয়া হয়ছে।

২। আয়াত ঃ فَلَاتَسْئَلْنِى عَنْ شَيْئٍ-

'এরূপ কোন ব্যাপারে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো না। (সূরা কাহাফ-৭০)

এখানে شَيْءٍ দ্বারা সাধ্যাতীত বস্তু বুঝানো হয়েছে।

কখনও 'খবর' (বিধেয়) বলে তার থেকে 'খবর' সংশ্লিষ্ট ঘটনা বুঝানো হয়। যেমন ঃ نَبَأٌ عَظِيمٌ (বিরাট খবর) এখানে عَظِيم বলতে সেই ভয়াবহ সংশ্লিষ্ট ঘটনা বুঝানো হয়েছে, যার জন্যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

এভাবে خير ও شر বা তার সমার্থক শব্দ দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নেয়া হয়। তাই অন্যান্য গুলোর মত এখানেও কখন কোন্ অর্থ হবে তা নির্ণয় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

বিক্ষিপ্ত আয়াত ঃ

আয়াত বিক্ষিপ্ত হলেও দুর্বোধ্যতা দেখা দেয়। কোন আয়াত এমন যে, সেটা মর্ম অনুসারে কোন কাহিনীর উপসংহার হিসাবে শেষে আসার কথা। অথচ আগেই এসে গেছে। তারপর নতুন করে আবার কাহিনী বর্ণনা চলেছে।

কখনও নাযিলের দিক থেকে অগ্রাধিকার পেয়েও কোন আয়াত পাঠের কালে পরে আসে। ফলে অর্থ ধরা মুশকিল হয়। যেমন ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ

অবশ্যই আমি তোমার বারংবার তাকানো লক্ষ্য করেছি। (সূরা বাকারা -১৪৩)

এ অংশটি আগে নাযিল হয়েছে।

এবং سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ

শীঘ্রই মুর্খরা বলবে। (সূরা বাকারা-১৪২)

পরে নাযিল হয়েছে।

অথচ পাঠের সময়ে বিপরীত হয়ে আছে।

কখনও এমন দেখা যায় যে, কাফিরদের বক্তব্য বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তার জবাবও দেয়া হচ্ছে। এভাবে প্রশ্নোত্তরে জগাখিচুড়ী করে আয়াত শেষ হয়েছে। এতেও দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ

وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ-

'তোমাদের ধর্মানুসারী ছাড়া অন্য কারুর ওপরে আস্থা রেখো না। বলে দাও, নিশ্চয়ই হিদায়ত কেবল আল্লাহ্‌রই হিদায়ত। যদি কাউকে তা দেয়া হয়, তা তোমাদের মতই দেয়া হবে।' (সূরা ইমরান -৭৩)

এ আয়াতে قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ হচ্ছে কাফিরদের বক্তব্যের জবাব। এর আগের ও পরের বক্তব্যগুলো হচ্ছে কাফিরদের।

মোটকথা, এ আলোচনা বড়ই দীর্ঘ। এসব প্রতিবন্ধক ও জটিলতা এক এক করে বলা সময়– সাপেক্ষ। ওপরে যতটুকু আলোচনা করা হল, জটিলতা দূর করার জন্যে তা যথেষ্ট। যদি কোন মেধাবী পাঠক এগুলো স্মরণ রাখতে পরে, তা হলে যে কোন জটিলতায় কিছুটা মাথা ঘামিয়ে সে সমাধান বের করে নিতে পারবে। যা বলা হল, আর যে সব উদাহরণ দেয়া হল, সেগুলো থেকে যা বলা হয়নি, আর যে সব উদাহরণ দেয়া হয়নি, সেগুলোও বুঝে নেয়া তেমন কঠিন ব্যাপার নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুহকাম, মুতাশাবিহ, কেনায়া, তা'রীয, মাজাযে আকলীর আয়াত সমূহ

কুরআনে মুহ্কাম ও মুতাশাবাহি দু'ধরনের আয়াত রয়েছে। মুহ্কাম বলতে সে আয়াতগুলো বুঝায়, যেগুলোর অর্থ বুঝতে আরবী ভাষাবিদ কারুরই কোন দ্বিধা আসে না। সেগুলোর সহজ ও পরিস্কার অর্থ যা ধরা দেয়, তা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। ভাষাবিদ ও অভিজ্ঞ হবার মানদন্ড অবশ্য সেই প্রাচীন আরববাসী। এ যুগের সে সব ছিদ্রান্বেষী নয়, যারা গবেষণার দাপটে মুহ্কাম আয়াতকে মুতাশাবিহি ও সহজ-সরল আয়াতকে দুর্বোধ্য করে এবং কাছের অর্থকে দূরে ঠেলে দেয়।

মূতাশাবিহ্ আয়াত বলতে সেগুলোকে বুঝায়, যা থেকে একই সময়ে দুটো অর্থ নেয়া যেতে পারে। বাহ্যত এমন কোন নিদর্শন মেলে না, যা দিয়ে তার একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করা যায়। দুটোরই সম্ভাবনা সমান। এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টির কারণ অনেক হতে পারে। কখনও বাক্যের মধ্যে এমন একটা সর্বনাম আনা হয় যার সংশ্লিষ্টতা দু'জনের বেলায় সমান। যেমন কেউ বলল ঃ

اَمَا اِنَّ الاَمِيْرَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَلْعَنَ فُلاَنًا-لَعَنَهُ اللّٰهُ-

আমীর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন অমুককে অভিশাপ দেয়ার জন্যে। আল্লাহ্ তাকে অভিশপ্ত করুন।

এখানে কাকে অভিশপ্ত করতে বলা হল? অমুককে, না আমীরকে? 'হু' সর্বনামটি তো দু'জনের বেলাই সমানে সংশ্লিষ্ট। এখানে নিয়তের ওপরেই সব নির্ভর করছে। অন্যের কিছুই বলার নেই।

✪ কখনও আয়াতে এমন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার দুটো অর্থই সমান পর্যায়ের। যেমন لاَمَسْتُمْ অর্থাৎ তাকে স্পর্শ করেছ । (সূরা নিসা-৪৩)

আবার এর দ্বারা সহবাসও বুঝায়। এ দুটো অর্থ এরূপ সমান ক্ষমতাবান যে, কোন নির্দশন ছাড়া একটির পক্ষে মত দেওয়া চলে না।

✪ কখনও আয়াতে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়, যা ভিন্ন ভিন্ন দুটি বাক্যের সাথে সংযুক্ত হবার সম্ভাবনা রাখে। অথচ এমন কোন নির্দশন নেই, যা দিয়ে কাছের কিংবা দুরের বাক্যটির সাথে নিশ্চিতভাবে যুক্ত করা চলে। যেমন ঃ

وَامْسَحُوْ بِرُؤُ سِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ-

আর মুছে নাও তোমাদের মাথা এবং তোমাদের পা' গুলো। (সূরা মায়েদা-৬)

অর্থাৎ এখানে যদি ارجلكم। 'লাম' অক্ষরে 'যের' দিয়ে পড়া হয়, তা হলে رءوسكم -এর সাথে এবং 'যবর' দিয়ে পড়লে দূরবর্তী وجوهكم - এর সাথে সংযুক্ত হতে পারে। সুতরাং অর্থে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় যে, পা কি ধুতে হবে, না শুধু মুছে নিলেই চলবে?

✪ এভাবে যদি কোন বাক্যের কিংবা বাক্যাংশের ব্যাপারে এটা ধরা না যায় যে, এটা কি পূর্বের সাথে সংশ্লিষ্ট, না নতুন শুরু হল, তখনও কোন নিদর্শন না মিললে সন্দেহে পড়তে হয়। যেমন ঃ

وَمَايَعْلَمُ تَاوِيْلَهُ اِلاَّاللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِىْ الْعِلْمِ-

এর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না এবং জ্ঞানে যারা পোক্ত হয়েছে।

(সূরা আল-ইমরান-৭)

এখানে وَالرَّاسِخُوْنَ فِىْ الْعِلْمِ বাক্যটির অবস্থা অনির্দিষ্ট হয়ে আছে। এটা শব্দের সাথে সংযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা যতখানি রাখে, ততখানিই আবার নতুনভাবে শুরু হবার সম্ভাবনাও রাখে।

কেনায়া ঃ

কেনায়া অর্থ এমন কোন কথা বলা, যাতে বাহ্যিক অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য না হয়ে বরং সেটার অপরিহার্য পরিণতি বুঝানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

এ অপরিহার্যতা দু'ধরনের হতে পারে। স্বাভাবিক ও যুক্তিভিত্তিক। যদি বক্তব্যের পরিণতিটা স্বভাবতই বুঝা যায়, তবে হয় সাভাবিক। আর যদি বক্তব্য থেকে যুক্তির সাহায্যে পরিণতি বের করতে হয়, তা হলে হয় যুক্তিভিত্তিক। যেমন, তার পাক ঘর থেকে সর্বদা ধোঁয়া বেরোয়। তার মেহ্মান অনেক। অর্থাৎ, সে যাকে পায় দাওয়াত দেয়। আর সর্বদা পাক চলে বলেই সব সময়ে পাক ঘরে চুলা জ্বলে। এধরনের কেনায়া বাক্য হচ্ছে ঃ

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ-

অর্থাৎ 'তার হাত বড় খোলা।' মানে, সে খুব দাতা। (সূরা মায়েদা-৬৪)

ঠিক, তেমনি যদি কল্পিত কোন বস্তুকে বাস্তব কোন কিছুর সাহায্যে বুঝানো হয়, তখন তা হয় ইস্তেয়ারা যা কেনায়ার মতই।

এ ধরনের বাক্য ব্যবহার আরবদের ভেতরে ব্যাপক দেখা যায়। কুরআন-হাদীসেও এর নজীর প্রচুর। যেমন ঃ

وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ-

অর্থাৎ তাদের ওপরে পদাতিক ও অশ্বারোহী চড়াও কর। (সূরা ইসরা-৬৪)

এ আয়তে ডাকাতদের এমন এক সর্দারের কথা উল্লেখ করা হল, যে তার সাথীদের নির্দেশ দিচ্ছে, তোমাদের একদল ওদিক থেকে আর একদল এদিক থেকে পথচারীদের ওপর হামলা কর।

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّاوَمِنْ خَلْفِهِمْ سَداً

'আমি তাদের সামনে দেয়াল তুলেছি, পেছনেও দেয়াল তুলেছি। (সূরা ইয়াছিন-৯)

اِنَّاجَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلاَلاً-

আর তাদের ঘাড়ে বেড়ী লাগিয়েছি।' (সূরা ইয়াছিন-৮)

এখানে কাফিরদের মনেরভাব ও উদ্দেশ্যের অসহায়তা ও সংকীর্ণতা ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদের যেন চারদিকে প্রাচীর আর ঘাড়ে বেড়ী রয়েছে। তাই যে অবস্থায় আছে, তা থেকে চুল পরিমাণ নড়তে পারছে না। আর ভাল-মন্দ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ-

'এবং ভয়ে তুমি জড়োসড়ো হয়ে পা হাত গুটিয়ে বস। (সূরা কাছাছ-৩২)

অর্থাৎ মন স্থির করে চিন্তার বিশৃঙ্খলা ও কলুষতা বর্জন কর।

আরববাসীর কথোপকথনে এ ধরনের উদাহরণ অনেক মেলে। যেমন, তারা যখন কারুর বীরত্ব প্রকাশ করে, তখন নিজ তরবারির দিকে ইংগিত করে বলে, 'কখনও এদিকে মারে, কখনও ওদিক মারে।' এতে সে বুঝাতে চায়, বীরত্বে পৃথিবীতে তার তুলনা নেই। অথচ জীবনেই সে হয়ত তরবারি হাতে নেয়নি।

কখনও বলে, 'অমুক বলছে, দুনিয়ায় কেউ নেই তার সামনে দাঁড়াবার।' কখনও 'অমুক এরূপ করছিল' বলেই এমন কিছু করে দেখায় যেন রণাংগনে শত্রুকে কাবুতে পেয়ে মহাবীর কিছু করছে আর কি। হয়ত সে বেচারা না এরূপ করেছে, না বলেছে। কখনও বলে, 'অমুক আমার গলা টিপে ধরেছে।' কখনও বলে, 'অমুকে আমার গলায় আংগুল দিয়ে লোকমা বের করে নিয়েছে।'

এটা স্পষ্ট ব্যাপার যে, এ ধরনের কথা দিয়ে সাধারণ অর্থ বোঝানো হয় না। আমাদের ভাষা ও বাগধারায়ও এরূপ অনেক কথা প্রচলিত আছে।

তা'রীজ

অর্থ হচ্ছে পরোক্ষ আলোচনা। মানে, কথাটা সাধারণভাবেই বলে বিশেষ ব্যক্তিকেই ইংগিত করা। সে জন্যে তার দু' এটকা বৈশিষ্ট্য মাত্র বলে শ্রোতাকে আভাষে বুঝানো।

কুরআনে যখন এ ধরনের বর্ণনারীতি দেখা দেয়, তখন তা বুঝার জন্যে সংশ্লিষ্ট কাহিনী বা ঘটনাটি জানা থাকা দরকার হয়।

আমাদের হযরত (সঃ) যখন কারুর ব্যাপারে বিরক্ত প্রকাশ করতেন, তখন তার নাম না নিয়ে বলতেন ঃ

مَابَالُ اَقْوَامٍ يَفْعَلُوْنَ كَذَا وَكَذَا-

হল কি তাদের? এ সব করছে কেন?

কিংবা কুরআনে আছে ঃ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُه اَمراً..الخ-

'আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের কোন মীমাংসার পরে ঈমানদার নর-নারীর কিছুই বলার অধিকার থাকে না। (সূরা আহযাব-৩৬)

এখানে সাধারণভাবে মুমিন ও মুমিনাতদের কথা বলে মূলত বুঝানো হয়েছে হযরত যায়নব (রাঃ) ও তাঁর ভাইকে। আর ঃ

وَلاَيَاتَلِ اُولُوا الفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ

এ আয়াতে মর্যাদা ও অবদান প্রাপ্তদের উল্লেখ করে কুরআন মূলত হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে বুঝিয়েছে। (সূরা নূর-২২)

এ সব অবস্থায় মূল ঘটনা জানা না থাকলে মর্মোদ্ধার অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

মাজাযে আকলী

অর্থাৎ ক্রিয়াকে মূলকর্তা ছেড়ে অন্য এক কর্তার সাথে জুড়ে দেয়া কিংবা মূলকর্ম ছেড়ে অন্য কিছুকে সেটার কর্ম বলে দেয়া।

এটা তো করা হয় যখন সেই ক্রিয়া ও তার কৃত্রিম কর্তার ও কর্মের ভেতরে কোথাও সাদৃশ্য থাকে, কিংবা বক্তা যার ব্যাপারে এরূপ বলে সেও মূলকর্তা বা কর্মের কেউ নয়, কিংবা তার সাথে যোগ রাখে। যেমন, সাধারণত বলা হয়ঃ

بَنَى الْاَمِيْرُ قَصْرًا–

আমীর দালান গড়েছে।

অথচ আমীর তো আর নিজে গড়েনি। তেমনি বলা হয়ঃ

اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ–

বসন্ত তরি-তরকারী জন্ম দিয়েছে

এখানে বসন্ত তো আর তা জন্মায় না।

এ ধরনের বর্ণনারীতি কুরআনের অধিকাংশ স্থানে মেলে।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআনের সুক্ষ্ম বাক্য গাথুনী, চমকপ্রদ ও আশ্চর্য বর্ণনারীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাক-বিন্যাস ও বর্ণনা-বৈশিষ্ট্য

কুরআন অন্যান্য বই-এর পদ্ধতি অনুসারে বিষয়বস্তু বা তার শ্রেণী-ভাগ নিয়ে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ আকারে রচিত হয়নি। তাই যখন যে বিষয়ে যা চাই, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ-সূচী দেখে বের করার উপায় এতে নেই। কুরআনকে এক পত্রগ্রন্থ বলা চলে, কিংবা বলা চলে ফরমান-সমষ্টি। কোন বাদশাহ্ যেন প্রজাদের নামে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ফরমান জারী করেছেন। অবস্থা অনুসারে তা বদলে নয়া ফরমান জারী করেছেন। এভাবে বেশ কিছুকাল অনেকগুলো ফরমান জমে গেলে কেউ সেগুলো সংকলন করে গ্রন্থরূপ দিল। ঠিক তেমনি নিখিল সৃষ্টির বাদশাহ্ তাঁর প্রিয় রসূলের কাছে বান্দাদের পথ প্রদর্শনের জন্যে বিভিন্ন সময়ে অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আয়াত ও সূরা পাঠিয়েছেন। হযরত (সঃ)-এর যুগেই সে সূরা গুলোকে গুছিয়ে সুরক্ষিত করা হল। কিন্তু সেগুলো সাজানো হয়েছিল না। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) -এর যুগে সে সূরা গুলোকে বিশেষ এক ধারাবাহিক রূপ দিয়ে গ্রন্থ আকারে সংকলন করা হল। তার নাম দেয়া হল 'মাস্হাফ'।

রসূল (সঃ)-এর সাহাবাগণ সূরা গুলোকে চার ভাগে সাজিয়ে চারটি নাম দিলেন।

১। সাব্আ তুয়াল ঃ এতে সব চাইতে বড় সূরা সাতটি স্থান পেয়েছে।

২। মিয়ুন ঃ এতে শতাধিক কিংবা শত আয়াত বিশিষ্ট সূরা নেয়া হয়েছে।

৩। মাসানী ঃ শতের কম আয়াত সম্বলিত সূরার সমাবেশ।

৪। মুফাস্সাল ঃ ওপরের তিন শ্রেণী ছাড়া বাকী সব সূরা।

হযরত উসমানের যুগে কুরআন ঃ

কুরআন যথারীতি না সাজানো পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা ও ভাগ ঠিক ছিল। কিন্তু যখন যথারীতি সংকলিত হল, তখন এতে কিছুটা রদবদল ঘটেছে। আয়াতের মর্ম ও ব্যঞ্জনা অনুসারে মাসানীর তিন ভাগের দুভাগই মিয়ুনখন্ডের অন্তর্ভূক্ত হল। এভাবে অন্যান্য অংশের অল্প-বিস্তর রদবদল হয়েছে। হযরত উসামন (রাঃ) তাঁর খিলাফতের যুগে মাস্হাফের কয়েকটি কপি করিয়ে দেশের

বিভিন্ন অংশে পাঠিয়ে দেন, যেন সবাই এটাকেই অনুসরণ করে ও অন্য আকার দানের চেষ্টা না করে।

কোরআনের শুরু ও শেষ শাহী ফরমানের রূপে

যেহেতু কুরআনের সূরাগুলো ঠিক বাদশাহ্র ফমানের রীতিতে রচিত, তাই তার শেষ ও শুরু ঠিক দলীল পত্রাকারে রয়েছে। যে ভাবে কোন দলীল-পত্র আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু হয়, কোনটা লেখার উদ্দেশ্য দিয়ে শুরু হয়, কোনটিতে পত্রের লেখক ও প্রাপকের নাম শুরুতে থাকে, কোন পত্র শিরোনাম ছাড়াই লেখা হয়। কোন পত্র হয় লম্বা, কোনটি সংক্ষেপ। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ পাক কোন সূরা প্রশংসা দিয়ে আর কোনটি উদ্দেশ্যের ওপরে আলোকপাত করে শুরু করেছেন। যেমন ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

'এ হচ্ছে অনন্য গ্রন্থ। কোন সংশয়ের ফাঁক নেই এতে। সরল মানুষের পথ প্রদর্শক।' (সূরা বাকারা -২)

কিংবা

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا...الخ

এ সূরাটি আমিই নাযিল করেছি। আর আমিই ফরয করেছি। (সূরা নূর-১)

এ যেন ঠিক সাধারণ পত্র-রীতি। যথা ঃ

هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ-

এ সেই পত্র যার ওপরে অমুক আর অমুক একমত।

কিংবা

هذا ما اوصى به فلان-

এটা সেই দলীল যেটা অমুকে ওসীয়ত করে গেছে।

আমাদের হুযূর (সঃ) হুদায়বিয়ার যে শপথ ও সন্ধিনামা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তার প্রারম্ভও এভাবে হয়েছিল ঃ

هذا ما قضى عليه محمد-

এ সেই শপথনামা যা মুহাম্মদ (সঃ) সম্পাদন করল।

কোন কোন সূরা ঠিক পত্রের আরম্ভের মত লেখক প্রাপকের নাম দিয়ে শুরু হয়েছে। যেমন ঃ

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

'এ সেই মহান মর্যাদাবান বিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ।' (সূরা জাছিয়াহ-২)

كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ-

এ সেই গ্রন্থ, যার আয়াতগুলো মুহ্‌কাম করে আবার খুলে বর্ণনা করা হয়েছে। (সূরা হুদ-১)

কিংবা ঃ مِنْ لَدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ-

এতো সেই প্রভুর কাছ থেকে, এসেছে, যিনি বিজ্ঞতম ও সর্বজ্ঞ।

এ সব আয়াতের শুরুতে যে রীতি অনুসৃত হয়েছে, তা যে কোন ফরমান বা উর্দ্ধতনের পত্রের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। তাও এভাবে শুরু হয় ঃ

'মহামান্য খলীফার নির্দেশ জারী হল।' কিংবা 'অমুক শহরের বাসিন্দাদের মাহমান্য খলীফার নির্দেশ শুনানো হল।'

হযরত (সঃ) রোম-সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে যে পত্র লিখেছেন, তার প্রারম্ভও এভাবে হয়েছিল ঃ

من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم-

আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ (সঃ) এর পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নামে।

কোন কোন সূরা পত্রের ঢঙে কোন শিরোনাম ছাড়াই অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন ঃ

قَدْسَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا-

আল্লাহ্ তায়ালা সে নারীদের কথা শুনেছেন যারা নিজ স্বামীকে নিয়ে ঝগড়া করেছে। (সূরা মুজাদালাহ-১)

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ...الخ

হে রসূল! আপনি হালালকে হারাম করছেন কেন? (সূরা তাহরীম -১)

আরবদের বিশুদ্ধতম বাক্য কাসীদা আকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কাসীদায় মূল বক্তব্যের আগে ভূমিকাস্বরূপ 'তাশবীব' লেখা হয়। তাশ্‌বীবের ভেতরে অদ্ভুত ও

দুর্লভ চরণ, বিস্ময়কর ও ভয়াবহ ঘটনাবলী উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রাচীন রীতি। কুরআনের কোন কোন সূরায় এ রীতিও অনুসৃত হয়েছে।

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ..الخ

সূর্য যখন আঁধার কুন্ডলী ও তারকারাশি নিষ্প্রভ হবে....ইত্যাদি।

(সূরা তাকবীর-১-২)

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا-

পূণ্য শ্রেণীবদ্ধদের সারি ও শয়তান বিতাড়কদের বিতাড়ন কার্যের শপথ।

(সূরা ছফফাত ১/২)

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا...الخ

বিক্ষিপ্তকারী হওয়ার বিক্ষেপণ ও ভারি মেঘ বহনকারীর ভার বহন...ইত্যাদি।

(সূরা জারিয়াত ১-২)

সূরার শেষ ফরমানের রূপে ঃ

যে ভাবে পত্রের শেষে সারকথা বলে দেয়া হয়, কখনও মূল্যবান উপদেশ ও ওসীয়ত থাকে, কখনও উপসংহারে, পেছনের কথাগুলোর ওপরে জোর দেয়া হয়, কখনও তাদের সতর্ক করে দেয়া হয় যারা পত্রোল্লিখিত বিধি-নিষেধের বিরোধিতা করতে চায়, তেমনি কুরআনের বিভিন্ন সূরায়, কখনও বা কঠোরভাবে কিছুর ওপরে জোর দানের আয়াত দিয়ে শেষ করা হয়েছে। কখনও আবার ঠিক এভাবেই সূরাও শুরু করা হয়েছে।

এ ধরনের যে সব সূরা শুরু করা হয়েছে, সেগুলোর ভেতরে কোথাও আবার এমন ধরনের আয়াত রয়েছে যা বিরাট কল্যাণকর। আর তাতে অত্যন্ত উত্তম ও আলংকারিকভাবে আল্লাহ্র প্রশংসা করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবেই কোথাও আল্লাহ্ তায়ালার অবদান ও অনুগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

যেমন, এক সূরা শুরু করা হয়েছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভেতরে পার্থক্য ও বৈষম্যের কথা দিয়ে। মাঝখানে এ আয়াত রয়েছে ঃ

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى آللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

বলে দাও, সব প্রশংসা শুধু আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। আর সেই বান্দাদের ওপরে আল্লাহ্‌র শান্তি রয়েছে, যাদের তিনি সম্মানিত করেছেন। যাদের তারা অংশীদার ঠিক করেছে, তিনি তাদের থেকে উত্তম। (সূরা নামাল-৫৯)

এরপর ধারাবাহিক পাঁচটি আয়াতে এ বিষয়টিই অত্যন্ত উত্তম ও আলংকারিক রীতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ রীতিই সূরা বাকারায় যেখানে বনী ইসরাঈলদের সাথে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হয়েছে, সেখানে অনুসৃত হয়েছে। বিতর্কের সূচনা এভাবে করা হয়েছে ঃ

يَابَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ..الخ

হে বনী ইস্‌রাঈলগণ! আমার সে সব অবদান স্মরণ কর। (সূরা বাকারা ৪৮/১২২) ইত্যাদি আর এ বিতর্কের পরিসমাপ্তিও এ আয়াত দ্বারা করা হয়েছে। যে কথা দিয়ে বিতর্ক শুরু ঠিক তা দিয়েই তার সমাপ্তি ঘটানো চরম পান্ডিত্যের ওপরে নির্ভর করে।

এভাবে সূরা আল্‌ ইমরানে আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্কের উদ্বোধন করা হয় এ আয়াত দিয়ে ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ-

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে ধর্ম শুধু ইসলাম। (সূরা আল ইমরান-১৯)

যেহেতু আহলে কিতাবদের থেকে ইসলামের স্বীকৃতিটাই আলোচ্য বিষয় ছিল, তাই বিতর্কের শুরুই করা হয়েছে মূল দাবী উত্থাপনের ভেতর দিয়ে যেন বিতর্কের মূল কথা ধারণায় জেগে থাকে। এর আলোকেই যেন বিতর্ক চলে এবং জবাবের বেলায়ও এ উদ্দেশ্যটি সামনে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের সূরাসমূহ বিভিন্ন আয়াতে বিভক্তি করন ও তার রচনা রীতি

পাক কালামের ধরন-ধারনের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই, যেভাবে একটা কাসীদা, প্রশংসাসূচক কবিতা বিভিন্ন ধরনের কতিপয় চরণে বিভক্ত থাকে, তেমনি কুরআনের সূরাগুলোও বিভিন্ন ধরনের কতিপয় আয়াতে বিভক্ত রয়েছে। বেশী হলে এই বলা যেতে পারে কুরআনের আয়াত ও কাসীদার চরণের ভেতরে কিছুটা পার্থক্য রাখা হয়েছে। অবশ্য উদ্দেশ্যের দিক থেকে এ ব্যাপারটি উভয় ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব রাখে যে, পাঠক কিংবা শ্রোতার কেবল রসগ্রহণ ও চিত্ত বিনোদনের জন্যেই এগুলো পড়া বা শোনা উচিত নয়।

কুরআনের আয়াত ও কবিতার চরনের মধ্যে পার্থক্য ঃ

কবিতার চরণ ও কুরআনের আয়াতের ভেতরে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য হচ্ছে, এই, খলীল নাহ্‌ভী (বৈয়াকরনিক) কবিতার জন্যে যে রীতি-নীতি ও ছন্দ অলংকার শর্ত করেছেন, কবিতায় সেগুলো মেনে চলতে হয়। অন্য কবিরা এ ব্যাপারে তাঁর থেকেই শিখে নিয়েছিল। পক্ষান্তরে, কুরআনের আয়াতে যে ওজন ও ছন্দ নির্ধারিত হয়েছে, তা কবিতায় নির্ধারিত ছন্দ-স্পন্দনের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের এবং অধিকতর প্রকৃতি সম্মত। কবিদের কৃত্রিম ও ধরা-বাঁধা রীতি নীতির সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। কবিতা ও আয়াতের ভেতরে যে সব ঐক্যসূত্র রয়েছে, সেগুলো সাধারণ পর্যায়ের বৈ নয়। সে গুলো যাচাই করা কিংবা তা নিয়ে আলোচনা করা নিরর্থক। অবশ্য এ দূয়ের ভেতরকার পার্থক্য সৃষ্টিকারী ব্যাপারগুলো আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

কুরআন ও কবিতার ঐক্যসূত্র

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটির এবারে বিশ্লেষণ দিচ্ছি। ছন্দোবদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ কবিতা থেকে প্রত্যেক রসবোদ্ধাই রসগ্রহন করতে পারে। তাতে বিশেষ এক ধরনের রসানুভূতি ও আকর্ষণ থাকে। যদি সেগুলোর কারণ খুঁজে দেখা হয়, তা হলে জানা যাবে যে, বাক্যের অংশগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও

পরস্পর সম্পৃক্ত, সেরূপ প্রত্যেকটি বাক্যই শ্রোতার ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। সংগে সংগে তার আরও শোনার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। এ আগ্রহ ও অপেক্ষার মুহূর্তে যখনই সেরূপ আরও সাজানো বাক্য সামনে আসে, তখন সে খুশীতে উথলে ওঠে। যদি সে চরণ ছন্দের সাথে অলংকারের দিক দিয়েও সমান সফল হয়, তাহলে তো কথাই নেই। সুতরাং কবিতায় আকর্ষণ ও আনন্দ লাভের রহস্যটি মানুষের জন্মগত সূত্রেই পাওয়া। বস্তুত কোন দেশের কোন জাতি এমন নেই, যারা রসবোদ্ধা ও রুচিবান মানুষ হয়েও কবিতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না।

মাত্রা ও ছন্দের গাঁথুনীর এ প্রাকৃতিক ও সার্বজনীন সম্পর্ক সত্ত্বেও সব এলাকায় সে সবের ধারণা এক নয়। বরং মাত্রার অংশ ছন্দের শর্তসমূহের ব্যাপারে প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ধারণা ও দর্শন রয়েছে। তাই প্রত্যেক ভাষার কবিতা সৃষ্টির নিয়মনীতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। আরবরা বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ খলীলের দেয়া নিয়ম নীতির অনুসারী। ভারতবাসী এ ব্যাপারে ঠিক তাদের রুচি ও রীতি অনুসারে আলাদা নিয়মকানুন রচে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, যুগ বদলের সাথে সাথে মাত্রা ও ছন্দের নিয়মও বদলে যাচ্ছে। যখন মাত্রা ছন্দের সব নিময় কানূন সামনে রাখা সম্ভব হবে, আর তার সব গুলোর ভেতরে কোন ঐক্যসূত্র খুঁজে দেখা যাবে, তখন দেখা যাবে, সেগুলোর ভেতরে কাল্পনিক ও আপেক্ষিক কোন সূত্র ছাড়া কিছুই মিলবে না।

আরবী ও ইরানী নীতি ঃ

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আরবরা মাত্রা ও ছন্দের ব্যাপরে যতখানি স্বাধীনতা দেয়, ইরানীরা ঠিক ততখানিই কঠোরতা অবলম্বন করে। আরবদের কাছে কবিতার মাত্রার ক্ষেত্রে সামান্য এদিক ওদিক অন্যায় নয়। যেমন, তারা কবিতার মাত্রা "মাফাএলুন" مفاعيل এবং 'মুফতা এলুন' مفتعلن কে "মুস্তাফ এলুন مستفعلن এর স্থলে ব্যবহার বৈধ রাখে, আর বিনা দ্বিধায় তা অনুসরণ করে চলে। এমনকি তারা 'ফাএলাতুন' فاعلاتن ও 'ফুলাতুন' فعلاتن কে সমান মাত্রা বলতেও দ্বিধা করে না। এ ধরনের আরও বহু ছোট খাট ব্যাতিক্রমকে তারা কবিতার ক্ষেত্রে বৈধ মনে করে ও অবাধে তারা কবিতায় তা অনুসরণ করে চলে।

পক্ষান্তরে ইরানীরা মাত্রার বেলায় এরূপ ব্যাতিক্রম ন্যায় মনে করে না, এক্ষেত্রে কোনরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমার যোগ্য মনে করে না। ছন্দের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই অবস্থা। আরবদের কাছে 'কুবুর' । قبور শব্দের সাথে 'মুনীর' । منير শব্দের মিল ছন্দ পতন ঘটায় না। কিন্তু ইরানীদের বেলায় তা ঘটায়। আরব কবিরা হাসিল, حاصل নাযিল نازل ইত্যাদি শব্দ একই

মিলের মনে করে। কিন্তু ইরানীরা এ ব্যাপারে একমত নয়। আরববাসীর কাছে কোন শব্দের অর্ধেক এক চরণে বাকী অর্ধেক অন্য চরণে ব্যবহার চলে। কিন্তু ইরানীরা এ ধরনের শব্দ ব্যবহার সর্বতোভাবে অবৈধ মনে করে।

মোটকথা, আরব আর ইরানীদের ভেতরে কবিতার রীতিনীতি নিয়ে যত বেশী মতানৈক্য রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলতে হয়, এ দু'দেশের মাত্রা ও ছন্দের ঐক্যেসূত্র কাল্পনিক ও আপেক্ষিক ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভারতীয় বাক্য রীতি

ভারতীয় কাব্য রীতি ইরানী ও আরবদের থেকে স্বতন্ত্র। তারা কবিতার জন্যে যে মাত্রা ঠিক করেছে, তা অক্ষরের সংখ্যার ভিত্তিতে। হোক সে হসন্ত যুক্ত কিঙবা স্বরচিহ্ন যুক্ত। এ সত্ত্বেও এ মাত্রারীতি, রস সঞ্চার ও আকর্ষণ সৃষ্টি সমানেই করছে। আমি অনেক মুর্খ পল্লীবাসীকেও কবিতা রচনা করতে দেখেছি। তারা সুরের ওপরে ভিত্তি করে মিলিয়ে মিলিয়ে ছড়া গেঁথে যায়। আর তাতে এক বা একাধিক শব্দের কোরাস মিলাবার ছোট্ট চরণ থাকে। এরাও যে মাত্রা ও ছন্দ ঠিক করে, তার ব্যাতিক্রম করে না। তারা নিজেদের কবিতা পাঠের ঢঙে ঠিক আরবদের কাসীদা পাঠের ঢঙ অনুসরণ করে। আর এতেই সবাই রস ও আনন্দ পায়। এভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায় ও জাতি ভিন্ন ভিন্ন কাব্যরীতি অনুসরণ করছে। বাহ্যত সেগুলোর ভেতরে তারতম্য অনেক। তথাপি সবগুলোর ভেতরে একটা মৌলিক ঐক্যসূত্র রয়েছে।

সংগীত-রীতি

কবিতার মত গানেও মানুষের আকর্ষণ স্বভাবতই রয়েছে। আর দুনিয়ার সব এলাকার মানুষই গানে আনন্দ লাভ করে। কিন্তু রীতিনীতির বেলায় এখানেও বিভিন্ন জাতির ভেতরে পার্থক্য দেখা যায়। গ্রীকরা সংগীত চর্চার জন্যে যে রীতির প্রবর্তন করেছে, ও যে মাত্রা নির্ধারিত করেছে, তারা তার নাম রেখেছে মাকামাত। মাকামাতকে সামগ্রিক বস্তু ধরে নিয়ে তা থেকে বিভিন্ন সুর ও রাগসৃষ্টি করে। এভাবে ক্রমাগত এগিয়ে সংগীতরীতি একটা স্বতন্ত্র ও ব্যাপক বিদ্যায় রূপ নিল।

পক্ষান্তরে, ভারতীয়রা নিজেদের সংগীত চর্চার জন্যে ছ'টি মূলনীতি ঠিক করেছে। তার নাম দিয়েছেন রাগ। সে রাগ থেকে নানারূপ রাগীনী জন্ম নেয়। এভাবে ক্রমোন্নয়নের ধারা বেয়ে তারাও এটাকে একটা ব্যাপক ও স্বতন্ত্র বিদ্যায়

পরিণত করল। আর তা গ্রীক সংগীত রীতি থেকে স্বতন্ত্র রূপ নিল। কিন্তু আমরা পল্লীবাসীদের দেখে বুঝতে পাই, তারা গ্রীক ও ভারতী দু'রীতিকেই বাতিল করে দিয়ে নিজেদের রুচি ও মর্যী মোতাবেক স্বতন্ত্র সংগীত পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছে। সব আইন কানুন ভেংগে চুরে তারা এক জগাখিচুড়ি হৈ-হল্লা জুড়ে দেয়। অথচ তাতেও তারা গ্রীক ভারতী সংগীত শাস্ত্র অনুসারীদের চাইতে কোন অংশে কম আনন্দ পায় না।

যখন আমরা এসব ব্যাপার সামনে রাখি আর সংগীত চর্চার নানা বিদ্যা ও সেগুলোর ভেতরকার ঐক্যসূত্র তালাশ করি, তখন জানতে পাই কাব্যের মত গানেরও সেই ঐক্য নেহাৎ কাল্পনিক ও আপেক্ষিক।

সারকথা, সংগীত-বিদ্যা হোক আর কাব্য-শাস্ত্র হোক, দুয়ের বিভিন্ন রীতির ভেতরে যে ঐক্যসূত্র রয়েছে সেটা হল সুর সৃষ্টি। আর তার সম্পর্ক সেই মাত্রা বা রাগের সাথে জড়িত, যা আমরা কবিতা ও গানের সব রীতির ভেতরে সমানে পাই। বস্তুত, গান ও কবিতার সেই মূল সুরই সব বিদ্যার ভেতরকার একমাত্র ঐক্যসূত্র। রুচি ও রসবোধের সম্পর্ক সেই সুরের রেশেই বাঁধা। আর তা অবশ্যই কোন রীতি নীতির রশিতে ধরা দেয় না।

কুরআনের বর্ণনারীতিতে চিরন্তন সৌন্দর্যের চয়ন ঃ

বস্তুত আল্লাহ্ যখন এই মাটির মানুষের সাথে কথা বলতে চাইলেন, তখন সব কাব্য ও সংগীতের মূল ঐক্যসুর চিরন্তন সৌন্দর্যটি তিনি বেছে নিলেন এবং নানা দেশের নানান রীতি নীতি বর্জন করলেন, যা সদা পরিবর্তনশীল। আদতে, যুগে যুগে মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞান যে রীতি গড়ে তোলে, তা তাদের ক্রমাগত মূর্খতার পরিচয় দিয়ে চলে। তাই তা ছেড়ে বাক্য, বাক্য বা সংগীতের সামগ্রিক সৌন্দর্য সমষ্টিকে এভাবে কাজে লাগানো যেন বর্ণনার প্রতিটির ক্ষেত্রেই যথাযথ ও সুষমামন্ডিত হয়ে ওঠে। সেটাই নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ও সাড়ম্বর বর্ণনারীতি।

আয়াতের রচনারীতি ঃ

যদিও কুরআনের আয়াতের মাত্রারীতি প্রচলিত সব রীতির থেকে আলাদা, তাথাপি তা রীতি নীতি ছাড়া নয়। তার নিজস্ব বিশেষ নিয়মনীতি রয়েছে।

বস্তুত, কুরআনে বিভিন্ন সূরার ভেতরে যে রীতি অনুসরণ করা হয়েছে, সে সবের ভেতরকার সব রীতিগুলোর বৈশিষ্ট্যের মূল সূত্র ধরে নতুন এক রচনা রীতি নির্ধারিত করা চলে। কুরআনে মাত্রার জন্যে শ্বাস ও স্বরকে ভিত্তি করা হয়েছে।

'বাহরে ত্বাবীল' بحرطويل ও 'বাহরে মদীদ' بحرمديد এর মত ধরা বাঁধা মাত্রার আশ্রয় নেয়া হয়নি। তেমনি ছন্দের জন্যেও সেই পন্থা অনুসরণ করা হয়নি যা আমরা কবিতায় দেখতে পাই। বরং একটি শ্বাস নিয়ে যে শব্দ নিঃশেষিত হয়, সেই শব্দটি কুরআনের আয়াতে ছন্দের গ্রন্থি হয়ে দেখা দেয়; হোক তা আমাদের পরিকল্পিত ছন্দরীতির প্রতিকূল। কুরআনের মাত্রা ও ছন্দ রীতির এটাই চরম সংক্ষিপ্ত পরিচয়। অবশ্য এটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বটে।

প্রকৃতিগত শ্বাস প্রশ্বাসের যাতায়াতই কুরআনের আয়াতের ছন্দ রীতিঃ

মূলত বুকের ভেতরে শ্বাস প্রশ্বাসের যাতায়াত চিরন্তন ও প্রকৃতিগত ব্যাপার। যদিও শ্বাস বাড়ানো কমানো মানুষের ইচ্ছার ওপরে নির্ভরশীল, তথাপি শ্বাসকে যদি স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তার আসা যাওয়াটা একটা নির্ধারিত সময় অনুসরণ করে চলে। মানুষ যখন একবার শ্বাস টানে, তখন তার ভেতরে বিশেষ এক ধরনের প্রশ্বাস ক্রিয়া শুরু হয়। সেটা ধীরে ধীরে থেমে যায় এবং তখনই মানুষের দ্বিতীয়বার শ্বাস টানার প্রয়োজন হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের এই আসা যাওয়ার নির্দিষ্ট একটা সময় পেরিয়ে যায়। যদিও তা সুনির্দিষ্ট সময় নয়, সামান্য এদিক ওদিকও হয়ে থাকে, তথাপি এ বেশ-কমটা সীমার ভেতরেই থাকে।

সুতরাং বাক্য বা চরণের ভিত্তি যদি এই শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপরে রাখা হয়, তাহলে বিভিন্ন চরণের ভেতরে দু'তিন শব্দের বেশী তারতম্য দেখা দেয় না। বরং অধিকতর খাঁটি কথা তো এই যে, কোন শব্দের এক চতুর্থাংশ কিংবা এক তৃতীয়াংশের বেশী তারতম্য কমই দেখা দেয়। আর এ সামান্য পার্থক্য এমন গুরুতর কিছু নয়, যার ফলে চরণটি রীতির সীমা লংঘন করে কিংবা মাত্রা হারিয়ে ফেলে।

বস্তুত এর ফলে ক্ষতি তো তেমন হয়ই না, পরন্তু রচনার ক্ষেত্রে বাড়ানো কমানোর স্বাধীনতা পাওয়া যায় ও আগ্ পিছ্ করার সুযোগ মেলে। যার ফলে নিয়ম নীতির ভেতর দিয়েও বাক্যের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রাখার, এমনকি বাড়ানোরও সম্ভাবনা থাকে। (বলা বাহুল্য, কুরআন চৌদ্দশ বছর আগে আধুনিক মুক্ত ছন্দেরই প্রবর্তন করে গেছে।)

আয়াতের ওজন বা মাত্রা

বলা বাহুল্য, শ্বাসের এ সময়টিকেই কুরআনের মাত্রার মানদন্ড করা হয়েছে। সেটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দীর্ঘ, طويل মধ্যম,

متوسط ও হ্রস্ব, قصير। দীর্ঘ মাত্রার উদাহরণ হল সূরা নিসা, মধ্যম মাত্রার উদাহরণ হল সূরা আরাফ ও আন্‌আম এবং হ্রস্ব মাত্রার উদাহরণ হল সূরা শূরা ও সূরা দুখান।

কাফিয়া বা আয়াতের ছন্দ রীতি ঃ

আয়াতের মাত্রার মতই তার ছন্দরীতির ভিত্তিও হল শ্বাসের সময়। শ্বাসটি যে শব্দে গিয়ে নিঃশিষিত হবে, আয়াতের 'কাফিয়া' সেটাই নির্ধারিত হবে। কেবল সুক্ষ্ম অনুভূতি সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। শ্বাস গিয়ে 'আলিফে'ই শেস হোক কিংবা 'ইয়া'য় হোক, সে বাক্যের শেষ অক্ষর 'বা' হোক কিংবা 'জীম', তথাপি সেই 'কাফিয়া' হয়ে রসানুভূতির উদ্রেক করবে।

এই হিসেবেই 'য়্যলামূন' 'মুমিনীন' ও 'মুস্তাকীম' তিনটা ভিন্ন ধরনের শব্দ হয়েও পরস্পর সম্পর্ক রাখে এবং পরস্পরের 'কাফিয়া' হয়ে দাঁড়ায়। আর 'খুরুজ', 'মারাজ' 'তাওহীদ, 'তেবার', ফেরাক', 'এজাব', ইত্যাদি পরস্পরের ভেতরে যতই পার্থক্য রাখুক, তথাপি নির্ধারিত রীতির ভেতরেই শামিল থাকছে।

আলিফ দ্বারা সৃষ্ট ছন্দ ঃ

শেষে আলিফের সংযোজন ও "কাফিয়া" ছন্দের সৃষ্টি হয়। তেমনি, বাক্যের শেষে আলিফের সংযোজনও 'কাফিয়া' সৃষ্টি করে, হোক তার আগের অক্ষর বিভিন্ন। যেমন 'করীমা', 'হাদীসা' ও 'বাসিরা'। কারণ কুরআনের নির্ধারিত নীতিতে এরা এত দূরত্ব সত্ত্বেও 'কাফিয়া' সৃষ্টি করতে পারে।

পূর্বের অক্ষরের সমতাও অধিক শ্রুতি মধুর ঃ

এরূপ অবস্থায় যদি পূর্ব অক্ষরের সমতাও শর্ত করা হয়, তাহলে নীতির দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় হলেও অধিকতর শ্রুতিমধুর হবে ঠিকই। সূরা মরিয়ম এবং সূরা ফুর্‌কান তার সাক্ষর বয়ে চলছে। তেমনি যদি সব আয়াতের একই অক্ষরে গিয়ে সমাপ্তির শর্ত লাগানো হয়, যেরূপ সূরা কেতালের আয়াতগুলো 'মীম' অক্ষরে ও সূরা রহমানের আয়তগুলো 'নু' অক্ষরে শেষ হয়েছে তাতেও রস সৃষ্টির মাত্রা বাড়বে।

এভাবে আয়াতের এক বিশেষ সমষ্টির পরে কোন আয়াতের বারংবার উল্লেখের ভেতরেও বিশেষ ধরনের এক রস সৃষ্টি হয়। যেমন, সূরা শূরা, রহমান, সূরা কামার ও সূরা মুরসালাতের বর্ণনা রীতি।

সূরার প্রথমও শেষে "কাফিয়া" ছন্দের পরিবর্তন ঃ

কখনও শ্রোতার রুচি লক্ষ্য করে কিংবা বাক্যের সৌন্দর্যানুভুতি সৃষ্টির জন্যে প্রথম ও শেষ আয়াতের কাফিয়ার ঢং বদলে দেয়া হয়। যেমন, সূরা মরিয়মের শেষে ইদ্দা' ও হাদ্দা, এবং সূরা ফুর্কানের শেষে 'সালামা' ও 'কিরামা' এবং সূরা 'সোয়াদ' এর শেষে 'তীন' 'সাজেদীন' ও মুনজেরীন' এসেছে। অথচ এটা সর্বজনবিদিত যে এ সব আয়াতের প্রথম দিকের ছন্দরীতি (কাফিয়া) সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

কুরআনের "কাফিয়া" (ছন্দ) রীতি

ওপরে ওজন ও কাফিয়ার যে মানদন্ড বলে দেয়া হল, কুরআনের অধিকাংশ সূরাই এর ভিত্তিতে বিরচিত। যদি কোন আয়াতে এর ব্যতিক্রমে শেষ অক্ষরে কাফিয়া দেখা না যায়, তা হলে সেটাকে এমনি বাক্যের সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়, যার শেষে কাফিয়া বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য যে বাক্যটি বাড়ানো হয়, সেটাতে বিশেষ কোন বিধি নিষেধ থাকে না। কেবল আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শন কিংবা সাধারণ সতর্কবাণী থাকে। কাফিয়া মিলানোর জন্যে সাধারণত নিম্ন ধরনের বাক্যের সংযোজন ঘটানো হয় ঃ

وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ–

এবং তিনিই (আল্লাহ্) বিজ্ঞতম ও সর্বজ্ঞ।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْماً حَكِيْماً–

এবং আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞান বিজ্ঞানে অদ্বিতীয়।

وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْراً–

এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমরা যা কিছু কর, সব খবরই রাখেন।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ–

যেন তোমরা ভয় কর।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ

নিশ্চয়ই এর ভেতরে জ্ঞানীদের জন্যে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে। এভাবে কুরআন যেখানে সংকোচনের স্থলে সম্প্রসারণ নীতি অবলম্বন করেছে, সেখানেও এ পন্থা অনুসরণ করেছে।

فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْراً

এবং এ ব্যাপারে যারা খবর রাখে তাদের জিজ্ঞেস কর।

এভাবে আয়াতের ধারাবাহিকতায় কখনো ওলট পালট হয়েছে। কখনও আগ-পিচ করা হয়েছে। কখনও অক্ষর বাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। যেমন- الياس। এর স্থলে اِلْ يَاسِيْنَ

وَطُوْرِسِيْنِيْنَ এর স্থলে سيناء

ছোট আয়াতের সাথে বড় আয়াতের সম মাত্রায় আনার রহস্য ঃ

কুরআনে এ হিসেবে ওজনবিহীন কিছু আয়াত রয়েছে। কোন আয়াত তো সংক্ষিপ্ত, আর সাথেই রয়েছে লম্বা এক আয়াত। কিন্তু আদতে তাও মাত্রা ছাড়া নয়। কারণ এধরনের স্থানে হয় কাব্য বিন্যাসের এক বিশেষ ধারা অনুসৃত হয়েছে, নয় কোন প্রবাদ বাক্য গ্রহণ করা হয়েছে, কিংবা একই বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তাই ছোট আয়াতও অবশেষে বড় আয়াতের সমান মাত্রায় এসে গেছে।

কখনও শুরুর বাক্যাংশকে শেষের বাক্যাংশের তুলনায় ছোট করা হয়েছে। তার ফলে বাক্যের সৌন্দর্য ও রস অনেকগুণ বেড়ে গেছে। যেমন ঃ

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ

ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ

ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ-

এ ধরনের যে সব আয়াতে শুরুর দু' অংশ ছোট ও তৃতীয় অর্থাৎ শেষ অংশ বড় হয়, শ্রোতা অজ্ঞাতেই পয়লা দু'অংশ এক আয়াত ধরে নেয় এবং শেষ অংশকে দ্বিতীয় পাল্লায় তুলে ওজন সমান করে নেয়।

তিন বাহু আয়াত ঃ

এভাবে কখনও কখনও তিন যতিতেও বাক্য রচিত হয়ে। অর্থাৎ তিন যতি মিলে পূর্ণ এক চরণ ও চতুর্থ আয়াত একাই এক চরণ হয়। যেমন ঃ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ- فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ-

এ আয়াতে তিনটি অংশ আর তিনটি মিলে একটি পূর্ণ ওজন সৃষ্টি করেছে এবং তার পরের আয়াত সমান ওজনে এসেছেঃ

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ..الخ

কিন্তু যারা এ রহস্য বোঝে না, তারা এভাবে দুটো আয়াত না ধরে ধারাবাহিক কয়েকটি আয়াত মনে করে থাকে। সুতরাং এই সুন্দর মিলের ব্যাপারটি তারা দেখে না।

দুই যতি আয়াত ঃ

কখনও আয়াতে দু'টো যতি বা কাফিয়া নেয়। কবিতায় সাধারণত যে রূপ নেয়া হয়। যেমন ঃ

كالزَّهرفِى تَرَفٍ وَالبَدرِ فِى شَرفٍ–
وَالبَحرِ فى كرمٍ والدَّهرفى هِمَمٍ–

বড় আয়াতকে ছোট আয়াতের সম মাত্রায় ব্যবহারের রহস্য ঃ

কখনও পাশাপাশি দু'টি আয়াতের একটি হয় লম্বা, অপরটি খাট। তা সত্ত্বেও দুয়ের ভেতরে ওজন ঠিকই থাকে। এ সমতার রহস্য মূলত আয়াত দুটোর বর্ণনারীতিতেই নিহিত থাকে। মূল রহস্য হল এই, যখন ওজন কাফিয়াসহ কোন সুন্দর বাক্য সৃষ্টি হয়ে এক পাল্লায় আসে, আর অন্য পাল্লায় সহজ সাবলীল ও আকর্ষণীয় একটি বাক্য বসে, সুরুচি তখন তাৎপর্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটিকেই মূল্য দেয় বেশী। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সুযোগ থাকে যে, একটা কাফিয়া উপেক্ষা করে অন্য কাফিয়ায় গিয়ে ওজন শেষ করবে। সুস্থরুচির কেউ তখন এ দুয়ের ভেতরে আর অমিল অনুভব করবে না।

কিছু কিছু সূরাতে উল্লেখিত কাফিয়া মাত্রা আনা হয়নি ঃ

এ আলোচনার গোড়াতেই এরূপ বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে যে, কিছু সূরায় এ রীতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু কথাটা এ জন্যে বলা হয়েছে যে, কিছু আয়াতে আবার অন্য রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তাতে এ ধরনের কাফিয়া ও ওজন অনুসরণ করা হয়নি। বস্তুত, কতিপয় আয়াত সার্থক বক্তৃতা রীতি কিংবা পন্ডিতদের মুখনিসৃত প্রবাদ বাক্যের মতই বিশিষ্ট রীতিতে রচিত হয়েছে। নারীদের যে কাহিনী হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হয়ত আপনিও তা

শুনেছেন। তার কাফিয়ারও আপনি গুরুত্ব বুঝেছেন। তাতে অবশ্যই সেই ওজন ও কাফিয়া নেই, যা ওপরে বলে আসা হল।

কোন কোন সূরায় বক্তৃতার ঢঙ ছেড়ে পত্র রচনার রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তা নেহাৎ সরল ও সুস্পষ্ট। কোনরূপ অলংকারের ঝংকার সেখানে লক্ষ্য ছিল না। যেভাবে সবাই স্বাধীনভাবে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে, সরল সহজ কথাবার্তা চালায়, ঠিক তেমনি যেখানে স্বভাবতই কথা শেষ হয়, সেখানেই শেষ করে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের বাকরীতিতে রস ও আকর্ষণ সৃষ্টির রহস্য হল এই, আরববাসী স্বভাবতই সেখানে থামত, যেখানে তাদের শ্বাস থেমে যেত। বলা বাহুল্য বাক্য তাদের শ্বাসের শেষ সীমায় গিয়েই থামত। তাই সে বাক্যে স্বভাবতই বিশেষ এক ধরনের সামঞ্জস্য ও মিল সৃষ্টি হত। সেক্ষেত্রে সব শর্ত ও রীতিনীতি মুক্ত হয়েও তাতে আকর্ষন সৃষ্টিতে অসুবিধা হত না।

কুরআনের কোন কোন সূরায় ঠিক এই রীতিই অনুসরণ করা হয়েছে। এ রীতিতেই সে সব আয়াতগুলোকে লম্বা করা হয়েছে। সে যা-ই হোক আমি যতটুকু বুঝেছি, সবই বললাম। মূল সত্য তো কেবল আল্লাহ্ই জানেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চ ইলমের আয়াত এর পুনরাবৃত্তির কল্যানকর দিক

কুরআনের রীতিতে একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই, তাতে একই মর্মের আয়াতের বারংবার বিভিন্ন স্থানে পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে। তা যে বিশেষ কোন ব্যাপারে তাই নয় প্রায় সব ব্যাপারেই ঘটেছে। অধিকাংশ লোকের মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এরূপ করা হল কেন? একটা ব্যাপার একস্থানে বলেই শেষ করা হল না কেন?

মূলত, এর ভেতরে বড় রকমের কলা কৌশল ও কল্যাণকর ব্যাপার নিহিত রয়েছে। যেমন, আমরা যদি কাউকে কিছু শেখাতে বা বোঝাতে চাই, তার জন্যে দু'টি পথই হতে পারে। একটি পথ এই, যদি আমার বলার উদ্দেশ্য শুধু শ্রোতাকে একটি নতুন খবর শুনিয়ে দেয়াই হয়, তাহলে কেবল একবার তাকে তা বলেই শেষ করব। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য যদি হয় এই যে, একটি বিষয় শ্রোতার মাথায় এমনভাবে ঢুকিয়ে দেব, যেন সে তার সারবত্তা ও সৌন্দর্য বুঝতে পারে এবং তার গোটা চিন্তাধারা সেই রঙে রংগিয়ে ওঠে, আর তার সব কার্যকলাপ তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে বারংবার বুঝিয়ে বলা ছাড়া পথ নেই।

একটা ভাল কবিতার কথা ধরুন। আমরা কবিতাটি একবার শুনি। তার মর্ম জানতে পারি। তা থেকে রস গ্রহণ করি। তথাপি বারংবার সেটা শুনতে চাই আর প্রত্যেকবারই নতুনভাবে স্বাদ পাই। এতেই বুঝা যায় পুনরাবৃত্তি আনন্দও দেয়। মন ও মগজে তার ঘর বেঁধে দেয়। কুরআনেও পুনরাবৃত্তির দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন করা হয়েছে।

মূলত, কুরআন অবতীর্ণের উদ্দেশ্য ছিল দু'টি। কিছু ব্যাপার এমন রয়েছে, সেগুলো শুধু জানিয়ে দেয়াই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। আবার কিছু ব্যাপার এমনও আছে, যেগুলো মন ও মগজে বসিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমোক্ত ব্যাপারগুলো একবার বলেই শেষ করা হয়েছে। শেষোক্ত ব্যাপারগুলো বারংবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়েছে। যে সব বিধি বিধানের আয়াতের পুনরুল্লেখ ঘটেনি, সেগুলো শুধু জানিয়ে দেয়াই লক্ষ্য ছিল। মন ও মগজে স্থায়ীভাবে এঁকে দেয়া উদ্দেশ্য ছিল না। অবশ্য এটা আলাদা কথা যে, শরীয়ত সেগুলোও একবার মাত্র পড়ে বুঝে নেয়াকেই যথেষ্ট মনে করে না। বারংবার পাঠের নির্দেশ দেয়।

কুরআনে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটলেও একই বাক্যের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেদিকে যথেষ্ট খেয়াল রাখা হয়েছে। বস্তুত প্রতিবারেই নয়া বাক্য নতুন রীতিতে উত্থাপন করা হয়েছে, যেন তাতে আকর্ষণ বাড়ে এবং মানব প্রকৃতি একঘেঁয়েমি অনুভব না করে। একই বাক্য যদি বারংবার বলা হত, তাহলে তাতে স্বভাব এরূপ অভ্যস্ত হয়ে পড়ত যে, কোনই আকর্ষণ খুঁজে পেত না। কিন্তু বাক্যের রূপ ও ধরন ধারণ বদলে যাওয়ায় প্রত্যেকবারই স্বভাব নতুন আকর্ষণ লাভ করে। ফলে মন সেদিকে বারংবার নিবিষ্ট হয় এবং কথাটি পুরোমাত্রায় অন্তরে ঠাঁই করে নেয়।

মর্ম বিক্ষিপ্তকরণ

এখানে আরেকটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, একই সূরার ভেতরে সব ব্যাপারগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে কেন? কেন সে গুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়নি। মানে, শুরুতে আল্লাহ্র নির্দশন ও প্রশংসা বর্ণনা করতঃ তারপর ঘটনাগুলোর উল্লেখ করা হত। এরপর অবিশ্বাসীদের সাথে যুক্তি তর্কের অবতারণা করা হত। এভাবে সবগুলো একের পর এক করে সাজানো হত।

এ প্রশ্ন যথাযথ বটে। এটাও ঠিক যে, আল্লাহ্র জন্যে করাও কঠিন ছিল না। তিনি চাইলে সবই ধারাবাহিকভাবে বলতে পারতেন। তবে এ কথাও সত্য যে, আল্লাহ্র সব কিছুর ভেতরে কোন না কোন কলা কৌশল ও মংগলময় উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। আর সেটা তারাই বুঝতে পারে, যাদের নিকটে রসূল আসে আর যাদের কাছে এ বাণী পাঠানো হয়। কুরআন যেহেতু রসূলে আরবী (সঃ) এর ওপরে অবতীর্ণ হয়েছে, আর আরববাসীর কাছে পৌঁছেছে, তাই তাদের ভাষা ও বর্ণনারীতি সামনে রেখেই তা রচিত হয়েছে, যেন তাদের প্রকৃতি তথা মন মগজের সাথে পুরোপুরি খাপ খায়। কুরআনের আয়াত 'লাওলা ফুচ্ছেলাত আয়াতুহূ আ'জামীউন ওয়া আরাবীয়্যুন' ঠিক এ সত্যটির দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

মূলকথা হচ্ছে এই, কুরআন অবতীর্ণের সময়ে আরববাসীর কাছে ঐশী কিংবা মানবীয় কোন গ্রন্থই ছিল না। আজ আরব সাহিত্যিকরা যে ধরাবাহিকতা ও

রীতি নীতির ওপরে জোর দিচ্ছে, সে যুগের আরবদের কাছে তা ছিল অপরিজ্ঞাত। যে সব কবি ইসলামের যুগে ছিল না, তাদের লেখা কিংবা হযরত (সঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) এর চিঠিপত্র যদি অধ্যায়ন করা হয়, তাহলে এ সত্য আপনা থেকেই ধরা দেয়।

তাই কুরআনের ঘটনা বিন্যাসের ব্যাপারে যদি তৎকালীন আরবদের অজানা কোন পন্থা অনুসরণ করা হত, তা শুনে তারা হতভম্ব হয়ে যেত। ফলে তাদের বুদ্ধি এরূপ বিপর্যস্ত হত যে, সরল সহজ কথা বুঝতেও তাদের অসুবিধা হত। অথচ কুরআন তো শুধু তাদের কিছু জানিয়েই ক্ষান্ত হবার ছিল না; পরন্তু তাদের মন ও মগজে তার কথাগুলো বসিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। আর সে উদ্দেশ্য সাজানো গুছানো কথার চাইতে আকস্মিক কথা দ্বারাই বেশী সফল হবার ছিল। নাটকীয় বর্ণনাই শ্রোতার চিত্তকে অধিকতর আকৃষ্ট করে বলেই কুরআন সে পথ বেছে নিয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুরআনের অনন্যতা ও বিস্ময়কর দিক

যদি প্রশ্ন করা হয়, কুরআনে ওজন ও কাফিয়াই যখন অনুসরণ করা হল, তখন আরবের কবি সমাজে প্রচলিত রীতি অনুসরণ করল না কেন? তাতো কুরআনের বর্ণনার রীতির চাইতে বেশী আকর্ষণীয় ছিল। জবাব হচ্ছে এই, আকর্ষণটা আপেক্ষিক ব্যাপার। দেশ ও জাতির পার্থক্যে তাতেও পার্থক্য দেখা দেয়। আর প্রশ্নকারীর কথার সত্যতা মেনেও বলা চলে, হযরত (সঃ) নিরক্ষর বলে খ্যাত ছিলেন। সেখানে আরবী সাহিত্যে সম্পূর্ণ এক নয়া রীতি আমদানী করা তাঁর জন্যে যেমনি বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল, তেমনি তাঁর নবূওতের ও একটা উজ্জ্বল প্রমাণ ছিল। পক্ষান্তরে যদি কুরআন আরব কবিদের অনুসরণ করত, তাহলে কবিদের কাব্যে ও কুরআনে আরববাসী কোনই পার্থক্য সৃষ্টি করত না। ফলে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের অভাবে কুরআন তাদের প্রভাবিত করতে পারত না।

তাই দেখতে পাই, উঁচু দরের সাহিত্যিক আলংকরিত সমসাময়িকদের ওপরে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তরের জন্যে সম্পূর্ণ নয়া পথ গড়ে নেন। আর দাবী করেন, এ রীতিতে কেউ লিখতে পারে না। বস্তুত সবাই তার অনন্যতা স্বীকার করে নেয়। সহজেই তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়। পক্ষান্তরে যদি প্রাচীন প্রচলিত রীতিতে কিছু লিখে এরূপ দাবী করে, তাহলে দু' একজন সূক্ষ্ম সমালোচক ভিন্ন কেউ তার দাবীর সারবত্তা সহজে উপলব্ধি করে না। তাই তার শ্রেষ্ঠত্বও সহজে মেনে নেয় না। ঠিক এ রহস্যটিই কুরআনে পথনির্দেশ করেছে। তাই কুরআন সম্পূর্ণ এক নতুন পথ আবিস্কার করে তার শ্রেষ্ঠত্বের সামনে সকলকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছে।

কুরআনের বিস্ময়কর দিক

যদি প্রশ্ন করা হয়, কুরআন বিস্ময়কর হল কি করে? জবাবে বলব, বিভিন্ন কারণে।

১। একটা হচ্ছে, কুরআনের অনন্য ও বিশিষ্ট রচনা রীতি। আরবরা বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভার দাপট দেখাত। আর সেগুলোতেই তারা শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা চালাত। তা ছিল কবিতা, বক্তৃতা, পত্রাবলী ও বাক ধারার ক্ষেত্র। এ চারটি ছাড়া তাদের অন্য পথ ছিল না। নতুন পথ রচনারও শক্তি ছিল না। ঠিক সে অবস্থায় আরবে নিরক্ষর নামে খ্যাত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পূর্ণ এক নয়া রচনা রীতি আবিষ্কার করে দিয়ে অবশ্যই বিস্ময়ের সঞ্চার করেছেন।

২। তারপর বিনা লেখাপড়ায় আগের কোন জানাশোনা ছাড়াই অতীতের জাতিগুলোর সঠিক বিধি বিধান ও তাদের সর্বজন স্বীকৃত অবস্থার বর্ণনা করা কি আশ্চর্যের ব্যাপার নয়?

৩। তেমনি ভবিষ্যতে কি হবে না হবে, সে সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে সঠিক খবর দেয়া বিস্ময়কর নয় কি? শুধু বিস্ময়কর নয়; বরং বিস্ময়ের একটা ধারাবাহিক ব্যবস্থা বটে। যাতে করে যুগে যুগে সে সব ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা দেখে মানুষ বিস্ময় অর্জন করে চলে।

৪। তাছাড়া কুরআনের আলংকারিক শ্রেষ্ঠত্বও একটা পরম বিস্ময়। এ শ্রেষ্ঠত্ব এমন যে, কোন মানুষ তার নাগাল পায় না। আমরা যেহেতু আরবী ভাষা ও সাহিত্যের আদি পর্ব থেকে অনেক পরে এসেছি, তাই আরবী ভাষার সৌন্দর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা কম। ফলে আমরা না তার গভীরতায় পৌঁছতে পারি, না তার মূল্যায়ন আমাদের দ্বারা সম্ভব। অবশ্য এতটুকু বলা চলে যে, কুরআনের মত এতখানি উন্নত ও চিত্তাকর্ষক বাকবিন্যাস ও শব্দের এরূপ স্বতঃস্ফুর্ত ও অবাধ প্রয়োগ প্রাচীন ও নবীন আরবী সাহিত্য সম্পদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য এ সত্যটি কেবল উঁচুদরের ভাষাবিদ ও সাহিত্য রসিকই উপলব্ধি করতে পারেন। সে জন্যে যতখানি সূক্ষ্ম রসবোধ ও সুস্থ বিচার শক্তি থাকা দরকার, তা উঁচুদরের কবি সাহিত্যিক ছাড়া কারুর ভেতরে থাকে না।

কুরআনের আরেকটি বিস্ময়কর দিক হল এই, যদিও তার বর্ণনা রীতি ও প্রকাশ ভংগী প্রতি মুহূর্তে গতিশীল, পরিবর্তনশীল, তথাপি তার নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত রীতিতে কোনই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুত কুরআনের মর্ম নিদর্শন ও অবদান সংশ্লিষ্ট হোক, কিংবা ঘটনা বা বিতর্কমূলক হোক, কখনও গাতনুগতিক বর্ণনা একাধিক স্থানে ব্যবহৃত হয়নি। একটি ব্যাপার যতবারই বলা হয়েছে, আলাদা রূপ দিয়ে নতুন ভংগীতে বলা হয়েছে। প্রত্যেক স্থানেই বর্ণনার অনন্য সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রয়েছে। সেখানে কারুর হাত দেবারই কল্পনা অচল।

এ আলোচনাও যদি কারুর সত্য উপলব্ধির সহায়ক না হয়, তাহলে সে যেন সূরা আরাফ, সূরা হুদ ও সূরা শূরার যে সব জায়গায় আগেকার নবীদের অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো দেখে নেয়। তারপর তার সূরা 'সাফ্‌ফাত' এর কাহিনীগুলো এবং সূরা 'যারিয়াত' পড়ে দেখা উচিত। এভাবে যখন সে এক ব্যাপারকে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখবে, তখনই তার কাছে মূল সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

তেমনি যেখানে পাপীর শাস্তি পূণ্যবানের পুরস্কারের উল্লেখ রয়েছে, সেখানেও সম্পূর্ণ নতুন নতুন ভংগীতে বর্ণনা করা হয়েছে। জাহান্নামীদের সাথে যে সব জায়গায় বিতর্ক ও বাদানুবাদের উল্লেখ রয়েছে, সে সব জায়গায়ও নতুন নতুন বর্ণনা রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সে যা হোক, এ ধরনের উদাহরণ দু' একটাই নয় বরং গোটা কুরআনই এতে ভরপুর রয়েছে। তা আলোচনা সময় সাপেক্ষ।

অলংকার প্রয়োগ ঃ

কুরআনে অনাড়ম্বর সাড়ম্বর দু'ধরনের বর্ণনাই বিদ্যমান। যেখানে যেরূপ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তাই করা হয়েছে। এরূপ ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে অলংকারশাস্ত্র পড়া দরকার। রূপক বাক্য কিংবা ইংগিতময় বাক্য সম্পর্কে জানতে হলেও সেটা দেখা দরকার। কুরআন তার শ্রোতাদের অযোগ্যতা ও অলংকারশাস্ত্রে অজ্ঞতা সম্পর্কে অবহিত থেকেও এরূপ আশ্চর্য সার্থকতার সাথে সে সব অনুসরণ করেছে যে, সব ধরনের লোকই তা সমানভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে। এভাবে সব দিক সমানে রক্ষা করে এরূপ অনুপম রচনা সৃষ্টি সত্যিই বিস্ময়কর বটে।

زفرق تاقد مش هرکجاکه من نکرم

کرشمه دامن دل می کشد که حال این جاست

يَزِيْدُكَ وَجْهُهٗ حُسنًا إِذَامَازِدْتَه نظرًا

উপসংহার ঃ

মোটকথা, এর এসব দিক ছাড়াও আরেকটি বিস্ময়কর দিক রয়েছে, যা শরীয়তের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে যারা অনবহিত, তাদের পক্ষে বুঝা সহজ নয়। তা হচ্ছে স্বয়ং কুরআনের সামগ্রিক রূপ ও তার বর্ণিত মর্মগুলো। তার ব্যাপ্তি, গভীরতা, সার্বজনীনতা ও অকাট্যতা-সব কিছুই তার শ্রেষ্ঠত্বের বড় দলীল। আর এগুলোই প্রমাণ করে, কুরআন বান্দার পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ্র অবতীর্ণ গ্রন্থ বৈ নয়।

কোন বিদ্যাবিশারদ এবং বিজ্ঞ ডাক্তার যখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিখ্যাত কোন গ্রন্থ অধ্যায়ন করেন, আর তাতে রোগের কারণ ও লক্ষণ সম্পর্কে বিজ্ঞতাপূর্ণ বিশ্লেষণ দেখতে পান এবং ঔষধের বর্ণনা ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আলোচনার ওপরে নজর ফেলেন, তখন তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হন যে,

এ গ্রন্থ রচয়িতা একজন বিচক্ষণ ডাক্তার চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। পক্ষান্তরে, একজন সাধারণ লোক তা দেখে কিছুই অনুমান করতে পারে না।

কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝার অবস্থাটি ঠিক তেমনি ব্যাপার। তত্ত্বোপলব্ধির ক্ষমতা নেই এমন সাধারণ স্তরের কেউ কখনো কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারে না। পক্ষান্তরে, শরীয়ত তথা বিধি-বিধানের রহস্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যেহেতু ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারের জন্যে কতটুকু কিসের প্রয়োজন তা জানে, তাই তখন সে কুরআন অধ্যায়ন করে সংগে সংগে বুঝে ফেলে যে, এ সবের মর্ম অভিজ্ঞানের সেই উচ্চতম শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে মানুষের প্রবেশাধিকার নেই আদৌ। সুতরাং সে কুরআনের বিস্ময়কর শক্তি ও তার আল্লাহ্‌র বাণী হওয়ার ব্যাপারটি স্বতঃস্ফূত ভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

وَالشَّمسُ الساطعةُ تَدَلُّ بنفسها علىٰ نَفْسِها

فإن كنتَ فِى حا جةٍ إلى الدَّليلِ فَلا تُولِّ وَجْهكَ عَنْها

آفتاب امد دليل آفتاب

گر دليلت بايدازوى رومتاب

চতুর্থ অধ্যায়

তাফসীর শাস্ত্রের পদ্ধতি ও সাহাবা তাবেঈনের বিরোধ মীমাংসা

কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাফসীরকাররা পদ্ধতির দিক থেকে কয়েক দলে ভাগ হয়ে পড়েছেন।

একদল হচ্ছেন, "মুহাদ্দিস-মুফাস্‌সির"। তাঁরা আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য খুজতে সে ধরনের যত ঘটনা থাকতে পারে, সবই বিনা বিচারে জড়ো করা প্রয়োজন ভাবেন-হোক তা সসুত্র বা সুত্রহীন হাদীস, কিংবা তাবেঈ বর্ণিত অপ্রাসংগিক ঘটনা অথবা ইয়াহুদী বর্ণিত এমন সব ঘটনা, যার সত্যাসত্য নির্ণয়ের কোন ভিত্তিই নেই।

২। দ্বিতীয় দল হচ্ছেন, "মুতাকাল্লেমীন-মুফাস্‌সির'। আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর ব্যাখ্যা দান তাঁরা প্রয়োজনীয় ভাবেন। অবশ্য তাঁরা তত্ত্ব পর্যন্ত যেতে রাজী নন, আল্লাহ্‌র অমর্যাদা হয় ভেবে। তাফসীরেও তাঁরা এ নীতি বহাল রেখেছেন। মানে, যে আয়াতের সাধারণ অর্থ আল্লাহ্‌র অমর্যাদাকর ভেবেছেন, ব্যাখ্যা ঘুরিয়ে নিয়েছেন, আর যারা সেই সোজা অর্থ করে গেছেন, তাঁদের সমালোচনা করেছেন।

৩। তৃতীয় দল হচ্ছেন, "ফকীহ-মুফাস্‌সির"। এদের ব্যাখ্যা পদ্ধতি হল এই, আয়াত থেকে তাঁরা হুকুম আহ্‌কাম খুঁজে বের করবেন। আর সে ব্যপারে যে যেই সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন, তার সপক্ষে ও তা থেকে আর যে যা করেছে বা করতে পারে, তার বিপক্ষে যুক্তি প্রমান জড়ো করে যাবেন।

৪। চতুর্থ দল হচ্ছেন, "লোগাতী-মুফাস্‌সির"। তাঁদের রীতি হচ্ছে, কুরআনের ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা। তাঁরা যে আয়াত সম্পর্কে যে মত গ্রহণ করবেন, তার সমর্থনে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে যত উদাহরণ থাকতে পারে, সব জড়ো করেন। তার আবশ্যকতা আদৌ থাক আর না-ই থাকে।

৫। পঞ্চম দল হচ্ছেন, "আদবী-মুফস্‌সির"। তাঁদের কাজ হচ্ছে, কুরআনে অলংকার ও সমালোচনা শাস্ত্রের মানদন্ডে কোথায় কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে, তা খুজে বের করা। সে সবকে যতভাবে যতখানি খুলে মেলে জোরালো করে তুলে ধরা যায়, তার প্রাণান্ত সাধনা করছেন তাঁরা।

৬। ষষ্ঠ দল হচ্ছেন, "কারী-মুফাস্‌সির"। কুরআনের নানা ধরনের কিরাত বা পঠনরীতি নিয়েই তাঁদের মাথা-ব্যথা বেশী। বস্তুত, তাঁরা কেবল এ বিষয়ের বিভিন্ন উস্তাদদের থেকে বর্ণিত কিরাতই উধৃত করেন। অবশ্য বিভিন্ন পঠনরীতির সুক্ষাতি সুক্ষ ব্যাপার নিয়ে হাংগামা সৃষ্টিও বৈধ মনে করনে না।

৭। সপ্তম হচ্ছেন, "সূফী-মুফাস্‌সির"। সূফীরা কুরআনের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সুত্রগুলোর খোঁজে ব্যস্ত থাকেন। যেখানেই এ ধরনের কিছু দেখতে পান, সেটুকু ব্যাখ্যা করাই তাদের কাছে তাফসীরকারের একমাত্র দায়িত্ব বিবেচিত।

সারকথা, ব্যাখ্যা-শাস্ত্রের মাঠটি বড়ই প্রশস্ত। প্রত্যেক মুসলিম কুরআন বুঝা ও তা নিয়ে গবেষণা করা ফরয মনে করে। তাই ব্যাখ্যাকারের সংখ্যা নগণ্য হবার নয়। অথচ এরা একভাবে কুরআন বুঝা বা বুঝাবার চেষ্টা না করে যার যা মনে এসেছে প্রত্যেকে আলাদা পথ বেছে নিয়েছে। আর নিজ প্রতিভা ও পান্ডিত্যের চূড়ান্ত রূপ ফলাও করার প্রয়াস পেয়েছে। নিজ মত ও মতা-বলম্বীদের সহায়তাকে অন্যতম কর্তব্য ভেবেছে। এভাবে এ শাস্ত্রে এত প্রশস্ততা দেখা দিল যা বলে শেষ করা যায় না। এমনকি তাফসীর গ্রন্থে যদি সব গণ্য করা হয়, তা হলে স্বীকার করতে হয় যে, তা গুণেও শেষ করা কঠিন।

জামে তফসীর ঃ

কিছুলোক এসব তাফসীর গ্রন্থ একত্র করার চেষ্টা করেছেন। কেউ ভো আরবীতে তা লিখেছেন, কেউ আবার লিখেছেন ফার্সীতে। কেউ সংক্ষেপে লিখেছেন, কেউ আবার বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। এতেও তাফসীরের সংখ্যা বেড়ে গেছে। আল্লাহ্ আমাকে কুরআন ব্যাখ্যার বড়রকম বুঝ দান করেছেন।

আমার সামনে এর সবগুলো গ্রন্থই রয়েছে। শুধু তাই নয়, এ সবের মূলনীতি ও কর্মপন্থাও আমার জানা রয়েছে। আমি স্বাধীনভাবে এগুলো নিয়ে অধ্যায়ন ও গবেষণা চালিয়েছি। এ সব তাফসীরের অধ্যায়ন ও গবেষণা আমাকে এ শাস্ত্রের একজন গবেষক ও বিশারদের মর্যাদা দিয়েছে।

এখন পর্যন্ত যে সব তাফসীরকারকদের কথা বলছি, তা বর্ণনার সুত্র ধরে আমার কাছে পৌছেছে। এ ছাড়া প্রত্যক্ষভাবেও কিছু তাফসীরের জ্ঞান আমি লাভ করেছি। সত্য বলতে কি, এ শাস্ত্রে আমি মূল থেকেই প্রেরণা লাভ করেছি। আর তা এরূপ এক সৌভাগ্যের ব্যাপার, যার কৃতজ্ঞতা আদায় করে শেষ করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই এ পুস্তকে তাফসীরের বিভিন্ন ধরন ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলোর ওপরে কিছু আলোচনা করা দরকার মনে করি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহাদ্দিস তাফসীরকারদের বর্ণনা প্রসংগ

তাফসীর শাস্ত্রের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বস্তু হল শানে নুযূল সমস্যা। অর্থাৎ যে ঘটনা উপলক্ষে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, তা বিচার-বিশ্লেষণ। আলোচনাটি বেশ দীর্ঘ ও বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

শানে নুযূল দুপ্রকার ঃ

শানে নুযূল মুলত দু'ধরনের। এক ধরনের হচ্ছে যে ঘটনাগুলো, ছাড়া আয়াতের যথার্থ অর্থ জানা অসম্ভব। যেমন, হযরত (সঃ)-এর সময়ে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে, যাতে ঈমানদারের ঈমান ও মুনাফিকদের নিফাক প্রকাশ পেয়েছে। তাই তাদের দু'দলের পরিচয়ই আলাদাভাবে মিলে গেছে। যেমন উহুদ ও আহ্যাবের যুদ্ধে এক ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা যে আয়াত নাযিল করেছেন, তাতে ঈমানদারদের প্রশংসা ও মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে, যেন উভয়ের কাজের ধারাটা সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়, আর দু'দলকে যেন আলাদা করে চেনা যায়। এ ধরনের আয়াতে এরূপ অনেক ইঙ্গিত মেলে যার সম্পর্ক থাকে সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিভিন্ন সূত্রের সাথে জড়িত। সে অবস্থায় সেই ঘটনাটি জানা ছাড়া আয়াতটির মর্ম অনুধাবন সম্ভব হয় না।

এরূপ এক্ষেত্রে তাফসীরকারদের অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় সেই ঘটনাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা, যেন পাঠকদের পক্ষে আয়াতের সূত্র জেনে মর্ম বুঝা সহজ হয়।

শানে–নুযূলের দ্বিতীয় ধরণটিতে আসে সে ঘটনাগুলো, যা উপলক্ষ করে আয়াত অবতীর্ণ হলেও আয়াতের মর্মের সাথে সে ঘটনার কোনই যোগ ছিল না। যে আয়াতে কোন সাধারণ হুকুম আহ্কাম থাকে সেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলোই এ শ্রেণীর আওতাভূক্ত রয়েছে। কারণ সাধারণ হুকুম বুঝতে তার সংশ্লিষ্ট বিশেষ ঘটনাটি জানা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় না। তাই এ ধরনের আয়াতের বেলায় শানে-নুযূল বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না। তথাপি আগেকার তাফসীরকাররা এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ ও প্রয়োজনীয় ভাবতেন। সম্ভবত কি ধরনের অবস্থার ওপরে এ হুকুমটি প্রযোজ্য, সেটা বোঝানোর জন্যেই তাঁরা তা করতেন।

সাহাবাদের ধারা ঃ

আমার মতে, শানে-নুযূল সম্পর্কে ভূল বুঝাবুঝি সাহাবা ও তাবেঈনের বর্ণনারীতির পার্থক্যের দরুন দেখা দিয়েছে। তাঁরা শানে-নুযূল বর্ণনা উপলক্ষে সাধারণ 'নাযালাতিল আয়াতু ফী কাযা' (এ ব্যাপারে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে) কথাটি ব্যবহার করতেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, তাঁরা এ কথাটি কেবল আয়াত সংশ্লিষ্ট বিশেষ ঘটনাটি সম্পর্কেই বলতেন না। বরং এ আয়াত যে সব ঘটনায় প্রযোজ্য, সেগুলো সম্পর্কেও এরূপ বলতেন। তাঁদের উদ্দ্যেশ্য থাকত, আয়াত দ্বারা যা যা বুঝা যেতে পারে, তারও উল্লেখ করা। তাঁরা এটা ভাবতেন না যে, ঘটনাটি আয়াতের আগে ঘটেছে, না পরে আর তার সম্পর্ক বনী ইসরাঈলদের বর্ণনার সাথে রয়েছে, না জাহেলী কিংবা ইসলামী যুগের সাথে রয়েছে। এমন কি সে ঘটনাটি উল্লেখিত আয়াতের শর্তাবলীর সাথে পুরোপুরি যোগ রাখে কিনা তাও তাঁরা ভাবতেন না।

এসব আলোচনায় জানা গেল, তাফসীর সম্পর্কিত বর্তমান আলোচ্য বস্তুটি কেবল রসূল (সঃ)-এর হাদীস ও সাহাবাদের বর্ণনায়ই সীমাবদ্ধ নয়; পরন্তু সাহাবা ও তাবেঈনের ব্যক্তিগত মতামত গবেষণাও এর অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়, একই আয়াত প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি ঘটনাই বর্ণিত রয়েছে, যেগুলোর আয়াতের হুকুমের সাথে পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট থাকার প্রশ্ন নেই। এই দু'টো রহস্য সামনে থাকলে শানে-নুযূলের ব্যাপারে যত প্রশ্নই দেখা দিক না কেন, সামান্য খেয়াল করলেই সমাধান মিলে যাবে।

এ প্রসঙ্গে ঘটনার বিস্তারিত আলোচনার ব্যাপারটি ও এসে যায়। কুরআন ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা ছেড়ে শুধু সেদিকে ইংগিত দিয়ে চলে গেছে। তাফসীরকার যখন সেরূপ আয়াত নিয়ে লিখতে বসেন, তিনি গোটা কাহিনী খুজে ফিরেন। তখন তাঁরা ইয়াহুদীদের বর্ণনা কিংবা তাদের ইতিহাস গ্রন্থ হাতড়িয়ে পুরো ঘটনাটি সংগ্রহ করেন। অথচ কুরআনের প্রতিটি ইংগিতই বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। অনেক আয়াতের মর্মই সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিশ্লেষণ ছাড়া আয়াতের ইংগিত বুঝা যায় না, সেগুলোর উল্লেখ তাফসীরকারদের কর্তব্য বটে। কিন্তু যেগুলো সেরূপ নয়, যেমন বনী ইসরাঈলের গরুটি কি গাই ছিল, না বলদ কিংবা আসহাবে কাহাফ্ এর কুকুর লাল ছিল, না কালো, সম্পূর্ণ বাজে আলোচনা। সাহাবারা এ ধরনের অহেতুক আলোচনাকে অন্যায় ও সময়ের অপচয় ভাবতেন।

এ ব্যপারে দুটো প্রশ্ন সামনে থাকা চাই। এক তো কুরআনে বর্ণিত ঘটনাগুলোর কোনরূপ অনুমানের আশ্রয় নেয়া উচিত নয়। যেভাবে ঘটনা পাওয়া গেছে, সেভাবেই বলে দেয়া চাই। কিন্তু আগেকার তাফসীরকারদের একটি দল সম্পূর্ণ নয়া রীতি অনুসরণ করেছেন। তাঁরা কুরআনের ইংগিতকে সামনে রেখে তার আলোকে ঘটনাটি মোটামুটি ভাবে অনুমান করে সংশয়ের সাথে বলে দিতেন। তাঁদের এই রীতির পরিণাম দাঁড়ালো এ, পরবর্তীকালের তাফসীরকাররা তাঁদের সে সংশয়ের সূত্রটিকে ধরে ঘটনাটিকে নিশ্চিত বলে ধরে নিলেন।

এ পর্যন্ত যেহেতু বিভিন্ন ধরনের কথার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রীতি নির্ধারিত ছিল না, তাই সংশয়পূর্ণ ও নিশ্চিত কথা গুলো মিলে জগাখিচুড়ী হয়েছে। ফলে অনিশ্চিতকে নিশ্চিত ও নিশ্চত কথাকে কখনও অনিশ্চিত ধরা হয়েছে।

বস্তুত ঘটনা লেখার এ ধারা আর অনির্ধারিত বর্ণনা– পদ্ধতিও সত্য বস্তুতে সংশয় ইত্যাদি বলে দেয়, তাফসীরের এ অংশটিও ব্যক্তিগত গবেষণা ও এ অনুমান প্রয়োগ থেকে মুক্ত নয়। তাই এখানেও মাথা খাটানো ও তর্ক-বিতর্কের বিরাট সুযোগ রয়েছে। যারা এ কথাটি মনে রাখে, তাদের জন্যে তাফসীরকারদের মতানৈক্যের স্বরূপ বুঝা ও সে সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় না। তারা সহজেই বুঝতে পারে, আলোচ্য সমস্যাটি সাহাবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা নয়। বরং সেটাও গবেষণা সাপেক্ষ। গোটা ব্যপারই সাহাবাদের তর্ক-বিতর্কের আর শংশয়-অনুমানের সমষ্টি মাত্র।

আমার মতে, ওযুর ব্যপারে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের ভূমিকাটি ও তদরূপ।

فَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ–

এবং তোমাদের মাথা মুছে ফেল ও পায়ের গিরা পর্যন্ত।

এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন– "আল্লাহ্‌র গ্রন্থ থেকে আমি শুধু মোছার নির্দেশ পেয়েছি। কিন্তু কেউ কেউ ধোয়া ছাড়া কিছুই স্বীকার করে না।"

বস্তুত হযরত ইবনে আব্বাসের এ কথা থেকে আমি যা বুঝেছি তা এই যে, তিনি পা মোছার মত পোষণ করেন না এবং সেটাকে ওযুর জন্য শর্ত ও ভাবে না। তাঁর মতেও পা ধোয়া প্রয়োজন। এখানে তিনি কেবল সে সমস্যাটির দিকে ইংগিত দিয়েছেন, যেটা প্রকাশ্য আয়াতের বিন্যাস অনুসারে সাধারণত ধরা দিয়েছে। তাই তিনি এরূপ কথা দ্বারা এ সমস্যাটি সম্পর্কে সমসাময়িক ব্যাখ্যা কাররা কি সমাধান দিতে চান, তাই জানতে চেয়েছেন। অথচ যারা তাঁর এ

উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন এবংতাঁদের বর্ণনারীতি সম্পর্কে ধারণা রাখতেন না, তাঁরা এ কথাটিকে তারা তাঁর সিদ্ধান্ত ধরে নিয়ে পা ধোয়ার স্থলে মোছাকেই তাঁর মযহাব বলে ঠিক করেছেন। অথচ এটা সত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আমাদের ধর্মীয় গন্থে সড়যন্ত্রমুলক ইয়াহুদী বর্ণনার অনুপ্রবেশ ঃ

ইয়াহুদীদের বর্ণনা ঃ

এ প্রসংগে ইয়াহুদীদের বর্ণনা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাদের বর্ণনার ভিত্তিতে কুরআনের অনেক ঘটনার বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে। অথচ তাদের বর্ণনার সত্যাসত্য সম্পর্কে আমাদের চুপ থাকতেই হয়েছে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট ঘটনার ব্যাপারে আমাদের দুটি ব্যাপার লক্ষ্য রাখতে হবে। কুরআনে ইংগিতময় ঘটনার যেগুলো সম্পর্কে আমাদের রসূল (সঃ)-এর কোন হাদীস মেলে না, আহলে কিতাবদের বর্ণনা বের করে সেগুলো বিশ্লেষণ করা আদৌ উচিত নয়। হাদীসে কিছু মিললেই সেটাই যথেষ্ট ভাবতে হবে। যেমন ঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

এবং অবশ্যই আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করেছি ও তার তখ্ত্ কাত করে ফেলে আবার সোজা করেছি। (সূরা ছদ-৩৭)

এ আয়াত প্রসংগে হযরত (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার সুলায়মান (আঃ) কোন ব্যাপারে ইচ্ছা জ্ঞান করতে গিয়ে 'ইন্শা-আল্লাহ' বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। সে কারণে আল্লাহ্ তা'আলা পাকড়াও করেন। অথচ ইয়াহুদীরা এ ব্যাপারে একটি পাথর ও একটি সাপের কাহিনী বর্ণনা করেছে। এরূপ ক্ষেত্রে হযরত (সঃ) এর বর্ণনার মুকাবিলায় সে বর্ণনার কি বৈধ্যতা থাকতে পারে?

দ্বিতীয়, ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে এ বিখ্যাত প্রবাদটি মনে রাখা দরকার, 'ততটুকুই চাই, যতটুকু প্রয়োজন।' মানে, কুরআনের ইশারার সাথে যতটুকু ঘটনা সংশ্লিষ্ট থাকে, ঠিক ততটুকুই বর্ণনা করা উচিত। তাহলে যা বলা হবে, কুরআনেও তার সমর্থন মিলবে। অতিরিক্ত বিশ্লেষণ বর্জনীয়।

কুরআন নিজেই নিজের ব্যাখ্যা ঃ

এখানে আরেকটি অত্যন্ত মজার ব্যাপার রয়েছে। তা হল এই, কুরআনে একই ঘটনা কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বা অপেক্ষাকৃতবিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। যেমন ফেরেশতাদের আপত্তি সম্পর্কে একখানে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ اِنِّى اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ–

আল্লাহ্ বললেন, তোমরা যা জান না আমি তাও ভালভাবেই জানি। (সূরা বাকরা ৩০)

তারপর অপর এক আয়াতে বলা হল ঃ

اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ–

আমি তোমাদের বলি নাই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে তোমাদের যত প্রকাশ্য ও গোপন কথা রয়েছে, সবই আমার জানা আছে। (সূরা বাকারা - ৩৩)

এটা ঠিক আগের কথাটিই। তবে তফাৎ এতটুকু যে, আগের বার সংক্ষেপে ও এবারে কিছুটা খুলে বলা হয়েছে। সুতরাং পয়লা আয়াতে যেটা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ ছিল, দ্বিতীয় আয়াতে তা পূর্ণ হয়ে গেল। এভাবে দ্বিতীয় আয়াত যেন পয়লা আয়াতের তাফসীর হল।

এভাবে সূরা মরিয়মে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী সংক্ষেপে বলা হয়েছে। যেমন ঃ

وَلِنَجْعَلَهُ اٰيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيًّا–

আর আমি তাকে মানুষের জন্যে নিজ নিদর্শন ও অনুগ্রহস্বরূপ গড়েছি। এটা এভাবেই হওয়া আমার মর্যী ছিল। (সূরা মারয়াম-২১)

আর এ ঘটনাটিকেই সূরা আল ইমরানে খুলে বলা হয়েছে ঃ

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ

এবং বনী ইসরাঈলদের কাছে নবী করে পাঠালাম, (সে বলল) আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র নিদর্শন নিয়ে এসেছি। (সূরা আল ইমরান-৪৯)

বস্তুত এ আয়াতে সুসংবাদটি খুলে বলা হল। পয়লা আয়াতে যেহেতু এ সংবাদটির সংক্ষেপে উল্লেখ ছিল, তাই তা থেকে আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে,.... দ্বিতীয় আয়াতের অর্থটি দাঁড়ায় এই ঃ

رَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ–

আমি বনী ইসরাঈলের কাছে এ খবর দেবার রসূল পাঠিয়েছি, (যে বলবে) আমি আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও অনুগ্রহ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি।

বস্তুত এ মর্মই সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা সূয়ূতী এর ব্যতিক্রমে অন্য একটি উহ্য কাজের সাথে এগুলোর সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ

فَلَمَّا بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى بَنِىْ اِسْرَا ئِلَ قَالَ لَهُمْ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ بِاَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ . . الخ

যখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বনী ইসরাঈলদের নিকট পাঠালেন, তিনি বললেন, আমি তোমাদের প্রভুর প্রেরিত পুরুষ। কারণ আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি।

আমার মতে, আল্লামা সুয়ূতীর অভিমত ঠিক নয়। অবশ্য আল্লাহ্ই ঠিক জানেন কোন্‌টা সত্য।

দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা দানে সলফের মতানৈকের কারন ও তার সমাধানের উপায়

দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা ঃ

কুরআনের 'গরীব' অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত ব্যাপারটিও মনোযোগ আকর্ষণের বস্তু। কারণ এর ভিত্তি দুটি বস্তুত ওপরে রয়েছে। এক তো আরবী অভিধানে এর অর্থ খুঁজে দেখা। দ্বিতীয়, বাক্যের আকার-ইংগিত ও অন্যান্য শব্দের যোগাযোগে এর অর্থ উদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালানো। আর দুটো ব্যাপারই নিজের ব্যক্তিগত মত ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগের ওপরে নির্ভরশীল। সুতরাং এখানেও বুদ্ধি এসে মাঝখানে দাঁড়ায়। এখান থেকেই মতানৈক্যের সুযোগ দেখা দেয়।

এ ব্যাপারে দুটো সত্য স্মরণ রাখা দরকার। একটা এই, একই আরবী শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়, মানুষের বুদ্ধির পরিমাণ এক নয়। তাই যখন বিভিন্ন লোক বাক্যের আকার-ইংগিত ও অন্যান্য শব্দের সাথে রেখে শব্দের বিভিন্ন অর্থের একটাকে নির্ধারিত করে, তখন তারা জ্ঞানের পরিমাপের বিভিন্নতার দরুন স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছে। এ কারণে মতানৈক্য দেখা দেয়।

এ ক্ষেত্রে সাহাবী ও তাবেঈনদের ভেতরে মতানৈক্য দেখা দেবার কারণ এটাই। প্রত্যেকেই নতুন মত দিয়েছেন। তাই নিরপেক্ষ তাফসীরকারের প্রয়োজন হচ্ছে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দু'বার দু'দিক থেকে বিবেচনা করে দেখা। এক তো আরববাসী সে শব্দটিকে যত অর্থে ব্যবহার করেছে, সবগুলো দেখা চাই। আর ভেবে দেখা চাই যে, এর ভেতরে কোন্ অর্থটি এখানে অধিকতর প্রযোজ্য। দ্বিতীয়, বাক্যের আকার-ইংগিত দেখা দরকার কোন্ অর্থটি এখানে অধিকতর উপযোগী মনে হয়। তারপরে সঠিক ও উপযুক্ত শব্দটি বেছে নেয়া দরকার।

আমার সিদ্ধান্ত ঃ

আমি এ ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করেছি। সব পূর্ব শর্তগুলোর ওপরে গভীর দৃষ্টি দিয়ে প্রয়োগ স্থলে পুরো বিবেচনার সাহায্যে প্রাসংগিক সব ব্যাপার খতিয়ে দেখে তারপর নতুন সিদ্ধান্তে পৌছেছি। আর তা এতই সূক্ষ্ম ও যথাযথ হয়েছে যা পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব না থাকলে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ তা থেকে এর সত্যতা বুঝতে সুবিধে হবে।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى

নিহত ব্যক্তির রক্তের বিনিময় গ্রহন তোমাদের ওপরে ফরয করা হল।

(সূরা বাকারা-১৭৮)

এখানে কিসাসের যে নির্দেশ রয়েছে, তার মূল রহস্য, হল এই, নিহত ব্যক্তি ও কিসাসের ভেতরে সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। এ আয়াতে ক্ষতি ও বিনিময়ের জন্যে শর্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাকেও কিসাসের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেয়া প্রয়োজন।। اَلْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى -এর ভেতরে এমনকি লিংগের যে শর্ত রয়েছে, তাও যেন লোপ না পায়। এ লিংগের শর্ত লোপ কিংবা শব্দের সাধারণ অর্থকে অপ্রয়োজনীয় বলার জন্যে এমন ধরনের কোন হেরফেরের প্রয়োজন নেই, যা সামান্য চিন্তা করলেই অর্থহীন মনে হতে পারে।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ

জনসাধারণ আপনার কাচে চাঁদ নিয়ে প্রশ্ন করে? (সূরা বাকারা-১৮৯)

আমার গবেষণা মতে এখানে 'আহিল্লা (চাঁদ) শব্দ দ্বারা 'আশহুর' (মাস) অর্থ নেয়া হয়েছে। কারণ এর পরেই যখন হজ্জের উল্লেখ এসেছে, তাতে

এখানে হজ্জের মাস সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়েছে। তাই জবাবে বলা হয়েছে ঃ

هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ-

এটা মানুষের সময়-জ্ঞানের ও হজ্জের উপায় স্বরূপ।

এখানে বিশেষ করে হজ্জের উল্লেখ আমার অনুসৃত অর্থের দিকে ইংগিত করে। তা না হলে শুধু সময়-নির্দেশক বলাই যথেষ্ট ছিল।

هُوَالَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ-

তিনিই আহলে কিতাবের ভেতর থেকে আল্লাহ্ দ্রোহীদের দেশ হতে নির্বাসিত করেছেন প্রথম হাশরের জন্যে। (সূরা হাশর - ২)

এখানে আমার মতে اول الحشر দ্বারা (প্রথম প্রেরিত সেনাদল) অর্থ নেয়া হয়েছে। দেখতে যদিও দুয়ের ভেতরে তেমন সাদৃশ্য মেলে না, কিন্তু অনুসরণ করলে দেখা যায়, কোন কোন স্থানে 'হাশর' শব্দ দ্বারা সেনাদল অর্থ নেয়া হয়েছে। যেমন ঃ

وَابْعَثْ فِىْ الْمَدَا ئِنِ حَاشِرِيْنَ-

এবং মাদায়নে সেনাদল পাঠাও। (সূরা শুয়া'রা-৩৬)

অপর এক জায়গায় হযরত সুলায়মান (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ-

এবং সুলায়মান নিজ সেনাদল সমবেত করল। (সূরা নমল-১৭)

এ বাক্যে 'হাশর' শব্দ সৈন্য সমাবেশের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

আলোচ্য যে, আয়াতটিতে আহলে কিতাবদের ভেতরকার কাফিরদের কথা বলা হয়েছে, মূলত তা বনু নজীরদের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই আমার ধারণা যে, আমি যে অর্থ বলেছি এখানে সেটাই অধিকতর প্রযোজ্য।

নাসিখ-মনসূখ-এর ব্যাখ্যা দিতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মতভেদ ঃ

আয়াতের নাসিখ-মনসুখ প্রশ্নও কুরআন ব্যাখ্যার কঠিনতম সমস্যা। কারণ সেটার যদি সঠিক জ্ঞান না থাকে তাহলে আয়াতের মর্মোদ্ধার মুশকিল হতে বাধ্য। তাই এ ব্যাপারে যে সব জটিলতা রয়েছে, তা বুঝে নেয়া দরকার।

এখানে সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার যে, 'নস্‌খ' শব্দটি বিভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। সাহাবা ও তাবেঈন এক অর্থে, মুহাদ্দিসরা অন্য অর্থে এবং উসূলী (মূলনীতি নির্ধারক) আলেমরা আরেক অর্থে ব্যবহার করেছেন। একই শব্দের তিন অর্থ অবশ্যই জটিলতা সৃষ্টির ছিল; তাই হয়েছে।

সাহাবাদের প্রয়োগ বিধি ঃ

সাহাবা ও তাবেঈন 'নস্‌খ' শব্দটিকে প্রায়ই আভিধানিক অর্থে অর্থাৎ কোন কিছু দুর করা বা লোপ করার অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের ব্যবহার অনুসারে 'নস্‌খ' অর্থ দাঁড়ায় এই, আগের আয়াতের কোন নির্দেশ পরের আয়াত দ্বারা বাতিল করা এবং তার বিভিন্ন ধারা হতে পারে। হয়তো পরবর্তী আয়াত দ্বারা এটা ব্যাখ্যা করে বলে দেয়া যে, আগের আয়াতের নির্দেশটির সময় পার হয়ে গেছে। অথবা পরবর্তী আয়াতে এমন কোন কথা থাকে, যার ফলে আগের আয়াতের সাধারণ নির্দেশটির বদলে চিন্তাধারা অন্য দিকে চলে যায়। ফলে পয়লা আয়াতের হুকুমটি আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যায়। তানসীখের কখনও এরূপ রীতিও দেখা যায়, পরবর্তী আয়াতে বিশেষভাবে কোন শর্তের ওপরে জোর দেয়ার ফলে আগের আয়াতের ব্যাপক নির্দেশটি সীমিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ নির্দেশটিকে মনসূখ ধরা হয়। কখনও আবার পরবর্তী আয়াতে এরূপ তথ্য মেলে যাতে করে আগের আয়াতের একটা অস্পষ্ট অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। ফলে আগের অর্থটি মনসূখ হয়ে যায়।

এটা এমনি এক ক্ষেত্র যে, মানবীয় বুদ্ধি প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যার ফলে দেখা দিয়েছে প্রচুর মতানৈক্য। যার ফলে মনসূখ আয়াত পাঁচশত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

মনসূখ আয়াতের ব্যাপারে দ্বিতীয় স্বরণযোগ্য কথা হচ্ছে এই, সবকিছু নির্ভর করে ইতিহাস জানার ওপরে। কারণ সাহাবাদের ব্যবহারে 'নস্‌খ, যতরূপ অর্থ দিয়েছে, তা থেকে এটা নির্ধারণ করা মুশকিল যে, কোন্‌টি সত্যিকারের মনসূখ, আর কোনটি নয়। তাই 'মনসূখ' আয়াত ঠিক করার জন্যে অতীতের ইতিহাস ঘাটতে হয়। কখনো অতীতের পূণ্যাত্মাদের সর্ববাদী সম্মত মতকে দলীল ঠিক করা হয়। কখনও আবার আলেমদের সর্বসম্মত রায়কে ভিত্তি করে মনসূখ ঠিক

করা হয়। সাধারণের কথা থাক–বড় বড় ফিকাহ্ বিদরা পর্যন্ত এ পথেই পা বাড়িয়েছেন। অথচ এ ধরনের ঐক্যমত বা ইজমার ওপরে নির্ভর করা ভূল। কারণ এ সম্ভাবনা থেকেই যায় যে, আয়াতের মর্ম ভূল বুঝা হয়েছিল। সে অবস্থায় 'মনসূখের আর আস্থা কোথায়? স্থুল কথা, মনসূখ আয়াতের বিতর্কটি অনেক ঘোরালো ব্যাপার। এর শেষ প্রান্তে পৌঁছা কঠিন ব্যাপার।

মুহাদ্দিসদের পথ ঃ

মুহাদ্দিসরা নিজেদের এক আলাদা পথ তৈরী করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কেবল আলোচ্য শ্রেণীগুলোকে যথেষ্ট ভাবেন নি। এ ছাড়া আরও বস্তু তাঁরা আমদানী করেন। যেমন সাহাবাদের ভেতরে যদি কোন ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক হল, সে ক্ষেত্রে কেউ একটি আয়াত প্রমাণ বা উদাহরণ স্বরূপ উত্থাপন করলেন কিংবা স্বয়ং রসূল (সঃ) সে আয়াতের কোন হুকুম পাঠ করে শুনালেন মুহাদ্দিসরা এ ধরনের সব জায়গাই উধৃত করেন। তাছাড়া আয়াতের ওপরে আলোকপাত করার মত যদি কোন হাদীস থাকে কিংবা রসূল (সঃ) বা তাঁর সাহাবাদের কেউ আয়াতের বিশেষ কোন উচ্চারণ রীতি বা অর্থ বলে থাকেন এ প্রসংগে তাঁরা তাও টেনে নিয়ে আসেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
ইস্তেম্বাত, তাওজীহ্, তা'বীল-এর আলোচনা

ইস্তেম্বাত ঃ

এ অধ্যায়ে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার ছিল, তার ভেতরে অন্যতম হচ্ছে, কুরআনের আয়াত থেকে মাসআলা বের করা বা ইস্তেম্বাত। এটা বড়ই বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ বিষয়। কারণ কোন আয়াত থেকে বিশেষ কোন হুকুম আহকাম জানতে হলে আয়াতের মর্ম, ইংগিত ও চাহিদা দেখতে ও বুঝতে হয়। তাই বুদ্ধির মারপ্যাঁচ খেলার এটা এক প্রশস্ত ময়দান। আর মতানৈক্যের পুরো সুযোগ এখানে দেখা দেয়। তার ফল দাঁড়ায় এই, সঠিক সিদ্ধান্ত পৌঁছা কিংবা কোন নিশ্চিত নির্দেশ জানা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। হুকুম-আহ্কাম ইস্তেম্বাত করার জন্যে যত পন্থা অনুসরণ করা হয়েছে, আমি সেগুলোকে দশ ভাগে ভাগ করেছি। সেগুলো বিশেষ এক পদ্ধতিতে সাজিয়ে একটা পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেছি। ইস্তেম্বাত করার বিধিবিধানগুলো যাচাই করার জন্য আমার সেই পুস্তিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড।

তাওজীহ্ বা বিশ্লেষণ ঃ

কুরআন ব্যাখ্যার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের আরেকটি হচ্ছে তাওজীহ্। এটা স্বতন্ত্র একটি বিষয়। এর অনেক শাখা-প্রশাখা ও ধরন রয়েছে। বইয়ের ব্যাখ্যাকাররা যখন কোন বই লেখা আরম্ভ করে, তখন সে সব ধরন থেকে কোন না কোনটি অনুসরণ করে তারা যে রীতিতে তাওজীহ্ (ব্যাখ্যা) করে, সেটা তাদের মন ও মগজের মানদন্ড হয়ে দেখা দেয় এবং ব্যাখ্যাকার হিসেবে তাদের স্তরও নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এতে জানা যায় যে, প্রত্যেকে একই ধরনের ব্যাখ্যা করে না। একই ধরনের সিদ্ধান্তেও পৌঁছে না। তাই মর্ম নির্ধারণ ও বিধি নিষেধ বের করায় মতানৈক্য দেখা দেয়। সাহাবাদের যুগে তাওজীহ্ বিশেষ কোন বিদ্যা হিসেবে রূপ নেয়নি। তাই তার রীতিনীতিও নির্ধারিত ছিল না। এ সত্ত্বে ও সে মান্যবরেরা ও কুরআনের আয়াতের বিশ্লেষণ ব্যাপক হারেই দান করেছেন।

তাওজীহ্ মূলত জটিলতার সমাধানকে বলা হয়। যেমন, কোন লেখকের লেখায় যখন কোন জটিল স্থান আসে, তখন ব্যাখ্যাকার থেমে গিয়ে সেটাকে

এমনভাবে খুলে মেলে বলে, যেন সবাই সহজে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। এটাকেই আরবী পরিভাষায় তাওজীহ্ বলা হয়।

কিন্তু যেহেতু সব পাঠকই সমস্তরের নয়, সবার বোধশক্তি সমান নয়, তাই একই বিশ্লেষণ সবার জন্যে যথেষ্ট নয়। বস্তুত নবীশদের জন্যে বিশ্লেষণের ধারা ভিন্ন হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে বিশেষজ্ঞদের জন্যে ধারাও অন্যরূপ হবে। তারা এ ব্যাপারে ইংগিত পেলেই যথেষ্ট ভাবে। পক্ষান্তরে এক নবীশের পক্ষে এ সব সূক্ষ্ম জটিলতার কল্পনাও করা অসম্ভব। এটা তো সোজা কথা যে, একজন নবীশের পক্ষে যা জটিল, বিশেষজ্ঞের কাছে তা কিছুই নয়। আর বিশেষজ্ঞের কাছে যা জটিল, নবীশরা সে সম্পর্কে ভাবতেও পারে না।

উত্তম বিশ্লেষনের ধরন ঃ

বিশেষজ্ঞরা নবীশদের মন মগজের পরিমাণ সামনে রেখে সে হিসেবেই বক্তব্য পেশ করেন। বস্তুত যে সব আয়াতে বিভিন্ন মতাবলম্বীর ভেতরে বিতর্কের ব্যাপার রয়েছে, তা বিশ্লেষণের উত্তম পন্থা হল এই, সেই মতগুলো আগে ব্যাখ্যা করা হবে। তারপর তার ওপরে আরোপিত অভিযোগগুলো পুরোপুরি যাচাই করবে। আর যে সব আয়াত বিধি বিধান সংশ্লিষ্ট, সেগুলোর বিশ্লেষণের ধারা হবে এই, বিধি বিধানের যত রূপ হতে পারে, সব উল্লেখ করবে। তার ভেতরে যে সব শর্ত ও বাধা-বন্ধক রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করবে। দেখবে, সেগুলো থাকা বা না থাকায় কি পরিণাম দেখা দেয়। মূল মাস্আলার ওপরে আলোকপাত করতে পারে, এভাবে সব বিষয়ই একে একে আলোচনা করবে।

যে সব আয়াত আল্লাহ্র অবদান সম্পর্কিত, সেগুলোর বিশ্লেষণের ধারা হবে এই, সে অবদানগুলোর চিত্র অংকিত করবে, আর তার সব আনুষঙ্গিক দিকগুলো বলে দেবে। যে সব আয়াত ঘটনা বা দুর্ঘটনা সম্পর্কিত, সেগুলোর বিশ্লেষণের ধারা হল এই, এ ধরনের সব ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে বলে দেবে। আর তার ভেতরে যত রহস্য ও ইংগিত রয়েছে সব উদ্ঘাটিত করে দেবে।

যে সব আয়াত মৃত্যু আর তার পরবর্তীকালের অবস্থা সম্পর্কিত, তা এভাবে বিশ্লেষণ করবে, যে সব অবস্থা দেখা দেবার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর চিত্র সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবে এবং সব অবস্থাগুলোর পুরোপুরি বিশ্লেষণ দান করবে।

এ পর্যন্ত বিশ্লেষণের একটি ধরন সম্পর্কেই বলা হল। এর আরও অনেক ধরন আছে। যেমন, কোন আয়াতের মর্মে জটিলতার জন্যে অসামঞ্জস্য মনে হল সেখানে বিশ্লেষণের ধরন হবে এই, অনুরূপ উদাহরণ তুলে ধরে পাঠকের ধারণার

কাছাকাছি করে দেবে। দুটি পরস্পর বিরোধী প্রমাণের জন্যে যদি তার বুঝতে অসুবিধে হয়, তার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দুটি প্রমাণের ভেতরকার বিরোধ মিটিয়ে দেবে। দুটি মর্ম যদি পরস্পর বিরোধী হয়ে দেখা দেয়, কিংবা সাধারণ অর্থের সাথে যদি যুক্তি-জ্ঞানের বিরোধ দেখা দেয়, তখনও এ দুয়ের ভেতরকার বিরোধ দূর করার মত বিশ্লেষণের দরকার। তেমনি দুটো আলাদা ব্যাপার যদি মিলে জগাখিচুড়ি হয়ে দাঁড়ায়, তখন ভুল সৃষ্টির কারণ দূর করে দেবার জন্যে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। যদি একই আয়াত ভিন্ন ভিন্ন দুটো বিধানের প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে দুটো বিধানের ভেতরে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস পাবে। কোন কোন স্থানে বিশ্লেষণের ধারা এও হতে পারে, আয়াতে যে সব প্রতিশ্রুতির কথা রয়েছে, তার সত্যতা ও যথার্থতা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা। বিশ্লেষণের এও একটি ধরন যে, কোন ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর জীবন থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে ব্যাপারটি সুপ্রমাণিত করে দেবে।

মোট কথা, সাহাবাদের তাফসীরে বিশ্লেষণের অনেক নজীর রয়েছে। বস্তুত এ বিষয়টি সব জটিলতার সর্ববিধ কারণ সবিস্তারে না করে যথাযথভাবে বুঝানো সম্ভব নয়। বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ সব ব্যাপারগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা সমাধান বের করে দিতে পারলেই এ বিষয়টির পুরোপুরি আলোচনা সফল হতে পারে।

তা'বীল বা গূঢ় অর্থ ঃ

তা'বীল সাধারণত মুতাশাবিহ্ আয়াতে করা হয়। তা'বীল অর্থ হচ্ছে, বাক্যের এমন কোন অর্থ বলে দেয়া, যা বাহ্যিক অর্থের বিরোধী। মুতাকাল্লেমীনরা এ ব্যাপারে বেশ বাড়া-বাড়ী সাথে কাজ করেছেন। তাঁরা প্রায় সব মুতাশাবিহ্ আয়াতেরই তা'বীল করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে আমি তা'বীল পছন্দ করি না। কারণ অধিকাংশ মুতাশাবিহ্ আয়াতের সম্পর্ক স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর গুণাবলীর সাথে সংযুক্ত। আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা আমার মত নয়। আমার তো ইমাম মালিক, সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও আগেকার সব মনীষীর মতেই মত। তা হচ্ছে এই, মুতাশাবিহ্ আয়াতেরও বাহ্যিক অর্থ অনুসরণ করা এবং তা নিয়ে গবেষণা ও তা'বীলের প্রশ্রয় না নেয়া। কারণ, এ ধরনের আয়াত থেকে উদ্ভুত আহ্কাম নিয়ে ঝগড়া করা, সে ব্যাপারে নিজ মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করে অন্যের মতবাদকে ঘায়েল করা ও কুরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাল্টে দেয়া আমার কাছে বৈধ নয়। বৈধ পন্থা হচ্ছে এই, আয়াত স্পষ্টত যে মর্ম প্রকাশ করে তা মেনে নেয়া এবং সেটাকেই নিজের মতবাদ মনে করা। অপরে কি বলল বা না বলল, তার পরোয়া করা ঠিক নয়।

কি কি কারণে আয়াতে সন্দেহ ও গরমিল দেখা দেয়, তা বলে এসেছি। এখানে প্রতিটি কারণের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

لُغَةُ القران

যদি অনিশ্চয়তার (তাশাবুহ্) কারণ হয় কোন শব্দ, তা হলে কর্ম পন্থা হবে এই, দেখতে হবে যে, প্রাচীন আরবরা সে শব্দটিকে কোন অর্থে ব্যবহার করত। তার পরে দ্রষ্টব্য হল সাহাবা ও তাবেঈদের ব্যবহার। যে অর্থের ওপরে তাঁরা একমত হয়েছেন, সেটাই গ্রহণ করবে।

نَحْوا لقران

কুরআনে নাহ্‌ভী (ভাষা ও উচ্চারণ তত্ত্ব) আলোচনার ফলেও কিছুটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। কারণ একদল সিবওয়ায় নাহ্‌ভীর অনুসরণ করে তার প্রতিকূল যা কিছু পেয়েছে, সম্ভব অসম্ভব সব রকমের হেরফেরের আশ্রয় নিয়ে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেছে। আমার মতে এটা অন্যায়। আয়াতের আকার ইংগিতে যা বেশী উপযোগী মনে হয়, সেটাই অনুসরণ প্রয়োজন। তা ফাররা নাহভীর অনুকুল হোক, কিংবা সিবওয়ায়। যেমন ঃ

وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ–

এবং নামায কায়েমকারী ও যাকাত আদায়কারী

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত উসমান (রাঃ) বলেন–

سَتُقِيْمُهَا الْعَرَبُ بِاَلْسِنَتِهَا–

আমার মতে, এ বাক্যাংশ ও বাক-রীতি বাহ্যত আরবদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত বাগধারার বিপরীত হলেও মুলত তা নয়। কারণ আরবরাই আরবী ভাষার জন্মদাতা। তাদের মুখ থেকে যাই বের হবে সেটাই দলীল হয়ে দাঁড়ায়। এটা কোন নতুন কথা নয় যে, আরবরা দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় ধারাবাহিক রীতি নীতির লংঘন ও করে থাকেন এবং তা কেউ অন্যায় ভাবে না।

কুরআনও প্রাচীন আরবদের ভাষায়ই নাযিল হয়েছে। তাই কোথাও 'و' স্থলে 'ى' এসে থাকে, কিংবা দ্বিবচনে একবচন বা পুংলিংগে স্ত্রী লিংগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আশ্চর্যের কিছু নেই। তাই এটা সর্বসম্মত কথা যে المقيمين। আদতে المقيمون। অর্থেই এসেছে।

ইলমে মা'আনী ও বয়্যান

ইলমে মা'আনী ও ইলমে বয়ান (ভাষা ও অলংকার শাস্ত্র) সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার। সাহাবা ও তাবেঈনের পরে তা রূপ লাভ করেছে। তাই কুরআনের বর্ণনা রীতির ব্যাপারে তার বিশেষ গুরুত্ব নেই। সুতরাং আরবরা সাধারণত যা সহজেই বুঝতে পারে, আমরা তা মাথা পেতে নেব এবং সেদিকেই লক্ষ্য রাখব। কিন্তু কপোলকল্পিত শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে রহস্য বিশেষ শাস্ত্রবিশারদ ছাড়া বুঝবে না, তেমনি কিছু কুরআনে আছে বলে আমরা স্বীকার করি না। তাই কুরআনের মর্মোদ্ধারে না সে সবের প্রয়োজন রয়েছে, না নিজকে অহেতুক তাতে জড়ানো উচিত।

সুফীয়াদের ইংগিত ঃ

তাসাউফপন্থী বা সূফী তাফসীরকারদের সৃষ্ট জটিলতার অবস্থাও তাই। তারা যে সূক্ষ্ম রহস্যের দিকে ইংগিত করেন, সে সব বিদ্যার সাথে তাফসীরের যোগ নেই আদৌ। আসল ব্যাপার এই, কুরআন শোনার সময়ে সূফীদের মনে বিশেস ভাব জেগে ওঠে। কুরআনের বিন্যাস আর সূফীদের চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মিকতা এ দুয়ে মিলে তাদের অন্তরে এক বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করে। তা থেকে তারাই শুধু আনন্দ পেতে পারে, অপরের বেলায় তার মূল্য নেই আদৌ। যেমন, কোন খাঁটি প্রেমিক যদি লায়লী মজনুর কাহিনী পড়ে, তখনই নিজ প্রিয়াকে স্মরণ করতে থাকে এবং তাদের দু'জনের ভেতরে যা কিছু ঘটেছে, সে সবের কল্পনায় ডুবে গভীর আনন্দ পায়। তাতে অন্যের কি? তাই সূফীদের রহস্য লীলাও তাফসীর শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় ।

ইলমুল ই'তেবার বা ন্যায় শাস্ত্র ঃ

এ আলোচনা প্রসংগে আরও এক জরুরী ব্যাপার মনে রাখা চাই। তা হচ্ছে এই, হযরত (সঃ) ও 'ইলমে ইতেবার' বা ন্যায়শাস্ত্র বৈধ রেখেছেন। তিনি নিজে তা অনুসরণও করেছেন, যেন উম্মতের জন্যে তা সুন্নত ও আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ যে জ্ঞান ভান্ডার দান করেছেন, তা বুঝতে ও তার মর্মমূলে পৌঁছতে যেন একটা রাস্তা মিলে যায়। যেমন ঃ

فامامن اعطى واتقى-

যে ব্যক্তি দান করল ও আল্লাহ্‌কে ভয় করল। (সূরা লাইল-৫)

এ আয়াতকে তকদীরের মাসআলায় উদাহরণ আনা হয়। অথচ তার সাধারণ তাৎপর্য হচ্ছে এই, 'যারা এ ধরনের কাজ করে, তাদের জন্য জান্নাত ও তার নিয়ামত রয়েছে এবং যারা বিপরীত পথে চলে, তাদের জন্যে জাহান্নাম ও তার কষ্ট রয়েছে। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে এ আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, প্রত্যেককে বিশেষ এক অবস্থার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে চাক বা না চাক, জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতে সে অবস্থায় থাকবেই।

এভাবেই নীচের আয়াত ঃ ونفس وماسواها

আল্লাহ্ পাপ ও পূণ্য সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। (সূরা শামছ-৭)

তবে এটা সত্য যে, পাপ পূণ্যের মূল রূপ ও যে পাপ-পুণ্য মানুষের মৌল সত্তায় প্রাণ সঞ্চারের সময়ে নিহিত থাকে-এ দুয়ে সামঞ্জস্য রয়েছে। তাই ন্যায় শাস্ত্রের ভিত্তিতে এটি তকদীরের মাসআলার আরেকটি দলীল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের দূর্লভ স্থান সমূহ

কুরআনের দুর্লভ স্থানগুলোও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীস গ্রন্থে এই সমস্ত সূরা ও আয়াতের গুরুত্ব ও মর্যদা বর্ণনার জন্যে ভিন্ন শিরোনামায় আলাদা অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। এগুলো কয়েক ধরনের।

১। তাযকির বিআলাইল্লার আয়াতে দুর্লভ স্থান ঃ

যে সব আয়াত আল্লাহ্‌র মহান নিদর্শন সম্পর্কিত, তার দুর্লভ স্থান হল আল্লাহ্‌র অনন্ত গুণাবলীর আলোচনা। যেমন, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা হাশরের শোষাংশ এবং সূরা মুমীনের প্রথম অংশ।

২। তাযকির বি আয়্যামিল্লার আয়াতে দূর্লভ স্থান ঃ

যে সব আয়াতে কাহিনী ও ঘটনা রয়েছে, তার ভেতরে দুর্লভ স্থান হচ্ছে তাই যার আলোচনা করা হয়েছে, কিংবা জানা ঘটনার কেবল প্রয়োজনীয় আনুষংগিক বলা হচ্ছে, অথবা যে ঘটনায় যথেষ্ট কল্যাণ-প্রসু তত্ত্ব রয়েছে। যেমন, হযরত (সঃ) মুসা ও হযরত খিযির (আঃ)-এর কিস্‌সা সম্পর্কে হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ আমার আকাংখা জাগে হযরত মূসা (আঃ) আরও কিছু সময় যদি হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারতেন এবং আল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে আরও কাহিনী আমাদের শোনাতেন।

৩। তাযকির বিল মাওতের আয়াতে দূর্লভ স্থান ঃ

যে সব আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে মৃত্যু ও পরকালের সাথে সেগুলোর ভেতরে যে সব স্থানে কিয়ামতের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, সেগুলোই দুর্লভ হয়ে থাকে। বস্তুত এক হাদীসে আছে। যে ব্যক্তি কিয়ামতের অবস্থানটি এভাবে জানতে চায় যে, কিয়ামতের অবস্থা যেন সে স্বচক্ষে দেখছে, তাহলে সে যেন 'ইজাস শামসু কুওভেরাত' ইজাস্ সামাউন ফাতারত" এবং ইজাস সামাউন শাক্কত সূরাগুলি পাঠ করে।

৪। ইলমুল আহকামের দুলর্ভস্থান ঃ

সংবিধান বিষয়ে দুর্লভ আয়াত বলতে আল্লাহ্ যে আয়াতে حدود-এর বিধানের নির্দেশ, কিংবা তার বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন, সেগুলোকেই বুঝায়। যেমন, জেনার শাস্তি শত দোর্‌রা, কিংবা তালাক প্রাপ্তার তিনটি অপবিত্র ও তিনটি পবিত্র কাল অপেক্ষা করা অথবা মীরাস বন্টন-বিধি।

৫। ইলমুল মুজাদালা রদুর্লভ স্থান ঃ

যে সব আয়াতে অন্য মতাবলম্বীদের অভিযোগ ও তার জবাব অভিনব পদ্ধতিতে রয়েছে তাতে দুর্লভ স্থান সেগুলো যাতে সব প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ও নিত্যন্ত বিস্ময়কর পদ্ধতিতে দেয়া হয়েছে, কিংবা তাদের পুরো রূপ তুলে ধরা হয়েছে। যেমন ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَنَارًا...الخ–

তাদের উদাহারন তারই মত যে আগুন জ্বালিয়ে আলো করল। (সূরা বাকারা ১৭)

এ আয়াতে কাফিরদের যথার্থ চিত্রটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে অংকিত করা হয়েছে। তেমনি মূর্তি–পূজার দোষ-ত্রুটি, স্রষ্টা ও সৃষ্টি, আর প্রভু ও ভৃত্যের ভেতরে যে তফাৎ দেখানো হয় এবং নতুন সুন্দর সুন্দর উদাহরণ দিয়ে তা বুঝানো হয়, সেগুলোও দুর্লভ আয়াত। এভাবে লোক দেখানো কাজ কিভাবে বরবাদ হয়, তার আলংকারিক বর্ণনাও দুর্লভ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

ওপরে যা বলা হল, কুরআনের দুর্লভ ও চমকপ্রদ গুণ কেবল সেগুলোতেই সীমিত নয়। আরও এমন বহু স্থান রয়েছে, যেখানে তা চরম পূর্ণত্ব লাভ করেছে। কখনও শুধু সালংকার রূপ কিংবা বর্ণনাভংগির জন্যেও আয়াতে চমৎকারিত্ব দেখা দেয়। সূরা আর্ রহমানের সব আয়াতই এ ধরনের দুর্লভ ও চমকপ্রদ। তাই এক হাদীসে একে 'কুরআনের দুলহান বলা হয়েছে। কখনও পাপী ও পূণ্যবানের আকর্ষণীয় চিত্র অংকিত হয়েও আয়াত দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

কুরআনের পেট ও পিঠ

এক হাদীসে কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

لِكُلِّ اٰيَةٍ مِنها ظَهرٌ وبطنٌ ولِكُلِّ حَرفٍ حدٌّ ولكل حدٍّ مُطَّلَعٌ

কুরআনের প্রতি আয়াতের একটি বাইরের, আরেকটি হচ্ছে ভেতরের দিক।

বস্তুত কুরআনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কিত পাঁচটি বিদ্যা ওপরে আলোচতি হয়েছে। জাহের বা বাহ্যিক দিক বলতে বাক্য সাধারণভাবে যা প্রমাণ করে এবং সবাই তার যে মর্ম বুঝতে পায়, সেটাই। আর বাতেনে আয়াত নিম্ন রূপ।

✪ তাযকীর বি আলাইল্লাহ্র বাতেন হচ্ছে গবেষণা। মানে আল্লহ্র অবস্থান এবং তাঁর সত্তা নিয়ে ধ্যান ও গবেষণা করা।

✪ তাযকীর বি-আইয়ামিল্লাহ্‌র বাতেন হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত ঘটনাবলীর রহস্য অর্থাৎ যার ওপরে প্রশংসা বা নিন্দা করেছে সে কারণগুলো ভেবে দেখা ও তাতে যে সব তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য রয়েছে, তার বাতেন থেকে উপদেশ হাসেল করা।

✪ তাযকির বিলজান্না অন্ নার-এর বাতেন হচ্ছেমানুষের মনে আশা-আশংকার ভাব সৃষ্টি হওয়া। এমন ভাব হওয়া যেন বেহেশত-দোযখ সে স্বচক্ষে দেখছে।

✪ আহকাম সম্পর্কিত আয়াতের আভ্যন্তরীণ দিক হল, আয়াতের আকার-ইংগিত থেকে আয়াতের অন্তর্নিহিত বিধিবিধান জেনে নেয়া।

✪ মুখাসিমা সম্পর্কিত আয়াতের ভেতরের ব্যাপার হল এই, মূল বিচ্যুতি ও অন্যায়গুলো উপলব্ধি করে তার ভিত্তিতে যত অন্যায় সৃষ্টি হতে পারে, সবগুলো আয়ত্বাধীনে আনা।

ওপরের হাদীসটির দ্বিতীয় অংশে আছে, "প্রতিটি সীমানার একজন সতর্ককারী রয়েছে" مطلع الظهر। -এখানে আয়াতের বাহ্যিক অর্থে 'মুত্তলে' বলতে আরবী ভাষা বুঝার কথা বলা হয়েছে। আর কুরআনের অর্থ বুঝার আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো বুঝানো হয়েছে।

مطلع البطن অর্থাৎ আয়াতের আভ্যন্তরীণ অর্থে, মুত্তালে বলতে বুঝায় বুদ্ধির তীব্রতা, বিবেকের সুস্থতা, অন্তরের ঐজ্জ্বল্য আর আত্মার প্রশান্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইলমে লাধুনী–আল্লাহ প্রদত্ত্ব জ্ঞান

নবীদের কাহিনীর তাৎপর্য

ইলমে তাফসীরের সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ্ প্রদত্ত বিদ্যার অন্যতম হচ্ছে, নবীদের কিস্‌সার তা'বীল সম্পর্কিত জ্ঞান। আমি এ বিষয়ে স্বতন্ত্র একখানা পুস্তক লিখে নাম দিয়েছি 'তাবীলুল আহাদীস'।

✪ স্মরণ রাখা দরকার যে, নবীদের যুগে যা কিছু ঘটেছে, তার অবশ্যই এমন একটা মূল সূত্র রয়েছে, যার সম্পর্ক রয়েছে সেই পয়গম্বর ও তাঁর উম্মতদের যোগ্যতার সাথে। সংগে সংগে তা সে যুগে আল্লাহ্র পছন্দনীয় কর্মপন্থা সম্পর্কেও ইংগিত দান করে। সে কাহিনীর ভিত্তি তিনটি। পয়গম্বরের যোগ্যতা, উম্মতের উপযোগিতা ও যুগের চাহিদা। সুতরাং কিস্‌সার তা'বীল অর্থ হচ্ছে এই যে, এ তিন বস্তুর আলোকে সে কিস্‌সার উদ্দেশ্য নির্ধারিত করা। এ কাজ সহজ নয়। আল্লাহ্র দান না হলে তা সাধন সম্ভবপর নয়। যেমন নীচের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

আর আমি আপনাকে 'তা'বীলে আহাদীস' শিখিয়েছি।

✪ পঞ্চ ইলম, যা কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয়, যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অত্র পুস্তিকার শুরুতে করেছি উহা ইলমে তফসীর সংশ্লিষ্ট আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান। তাই সেখানেই তা দেখা চাই।

✪ ফার্সী ভাষায় আরবী ভাষার অনুরূপ আমার তরজুমা কুরআন ও ইলমে লাধুনী (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান) কুরানের ফার্সী অর্থ করতে গিয়ে, শব্দ ও বাক্যের পরিমান-পরিমাপ, বাক্যের ব্যাপ্তি ও বিশেষ রূপের দিক দিয়ে যা কুরআনের মত। যার নাম দিয়েছে "ফতহুর রহমান ফিতরজুমতিল কুরআন" অবশ্য এ আলোচ্য বিষয়টির কয়েকটি ব্যাপার নিয়ে এ জন্যে বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম, যে পাঠকদের পক্ষে তা অনুধাবন সম্ভবপর হবে না।

কুরআনের বিশেষ ব্যাপার ঃ

ইলমে তাফসীর সম্পর্কিত চতুর্থ সংশ্লিষ্ট বিদ্যাটি হল কুরআনের বিশেষ ব্যাপার গুলোর জ্ঞান। যদিও এর আগে একদল এ নিয়ে কলম ধরেছেন, কিন্তু এ

বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন, লাখো গুণে ভাল ছিল তা না লেখা। কারণ কুরআনের বিশেষ ব্যাপারের মূলে তাঁরা আঘাত হেনেছেন। কিছু লোক সেটাকে দোয়ায় পর্যবসিত করেছেন। আর কিছু লোক তাকে প্রায় যাদু ও তাবীয করে ছেড়েছেন।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে আমাকে আগেকার অনুসৃত পথ থেকে সরিয়ে নয়া এক পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি পবিত্র নামাবলী, মহান আয়াত গুলো ও বরকতময় দোয়াগুলো এক সঙ্গে আমার আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন। আর এ দান আল্লাহ্ শুধু আমাকেই করেছেন। তাই এ ব্যাপারে আমি যা জানতে পেরেছি, তা সম্পূর্ণ পৃথক অনন্য ও উত্তম।

খাঁটি কথা তো এই, কুরআনের প্রতিটি আয়াত, আল্লাহ্র পবিত্র নামাবলীর ভেতরের প্রতিটি নাম এবং পাক কালামে প্রাপ্ত প্রতিটি দোয়া -এ সবের কয়েকটি শর্ত রয়েছে। অথচ সেগুলোর জন্যে কোন আইন কানূন প্রনয়ন করা চলে না। যদি কিছু করার থাকে তা হচ্ছে এই, 'অপেক্ষা কর ও দেখ যে, গায়েব থেকে কিছু প্রকাশ পায় কিনা? ইস্তেখারায় যেরূপ অপেক্ষা করে দেখতে হয় আল্লাহ্র তরফ থেকে কোন্ আয়াত বা নামের দিকে ইংগিত আসে, এও তেমনি। অবশ্য আয়াত ও উত্তম নামাবলী সম্পর্কে যদি নির্ধারিত রীতিনীতি অনুসারে কিছু বলতে হয়, তাহলে কোন বিশেষজ্ঞকে অনুসরণ করেই বলা উচিত।

এ বইয়ে এ বিষয় নিয়ে এর চাইতে বেশী কিছু বলা ঠিক মনে করি না। আমার যতটুকু বলার ছিল বলেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুকাত্তা'আত আয়াতের সমাধান

আল্লাহ্র তরফ থেকে বান্দার নগণ্য মগজে যে সব জ্ঞান অবতীর্ণ হয়েছে
তার ভেতরে অন্যতম হচ্ছে, মুকাত্তা'আত আয়াতের সামাধান ও মর্ম অনুধাব
শক্তি। কিন্তু মূল বিষয়বস্তু আলোচনার আগে কিছুটা ভূমিকা দরকার।

ভূমিকা ঃ বাক্য ও শব্দ যে বর্ণমালার ওপরে নির্ভরশীল, তার প্রতিটি
অক্ষরের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আর সে অর্থও এত মূল্যবান যে, দু' এক কথা
তা বুঝানো যায় না। তাই সংক্ষেপে হলেও কিছুটা বলে দেয়া উচিত।

আরবী বর্ণমালার বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম হচ্ছে যে, সব অক্ষরের মূ
পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও সাদৃশ্যমূলক, সেগুলোর অর্থ এক। পূর্ণ এক না হলে
কাছাকাছি হবেই। সুধী ও বিজ্ঞ সাহিত্যিকরা এ রহস্যটি বিশদভাবে আলোচ
করেছেন। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে যখন কোন শব্দে 'নূন' ও 'ফা' একত্র হয়
তখন যেভাবেই হোক 'বের হওয়া' অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, নফর, নফস
নফহ, নফখ, নফক, নফদ, নফজ- এ সব শব্দ কোন না কোন কিছুর 'ভেত
থেকে বের হয়ে আসা' বুঝায়। হোক, বৃক্ষ থেকে বা হাত থেকে বের হওয়া
মোট কথা সব ক'টি শব্দেরই ভিত্তি বের হওয়া।

এভাবে যখন 'ফা' ও লাম' কোন শব্দে মিলিত হয়, তখন ফেটে বা ভেে
যাবার অর্থ দেয়। যেমন, ফালাক, ফালাহ, এবং ফালাজ শব্দগুলোর ভেতে
প্রত্যেকটিই কোন না কোন কিছু ফাটা বা ভাঙ্গার অর্থ দেয়। হোক্ তা পা ভাঙ্গ
অন্ধকার বিদীর্ণ হওয়া বা বীজ ফেটে অঙ্কুর বের হওয়া।

আরবী বর্ণমালা সম্পর্কে চিন্তাশীল সাহিত্যিকরা যে সিদ্ধান্তে পৌছেছেন
তার ভেতরে একটি হচ্ছে এই, একটি শব্দের সব ক'টা অক্ষর এক এক কে
অদল বদল করা হয়, আর সেগুলোর উৎস ও উচ্চারণ যদি পরস্পর সন্নিহিত হ
তা হলে একই শব্দকে অসংখ্য অর্থে ব্যবহার করা চলে। আরবরা এ ধরনে
ব্যবহার প্রচুর দেখিয়েছেন। শব্দের অক্ষরগুলোকে এক এক করে উলট পাল
করে নিয়ে একই শব্দকে তাঁরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন, ق
এর ق কে ن এ বদল করে دن এবং سج এর ج কে ز তে বদল করে سز

ব্যবহার আরবী ভাষায় ব্যাপক দেখা যায়। এরূপ বহু উদাহরণ দেয়া চলে। কিন্তু যেহেতু আমার উদ্দেশ্য হল বর্ণমালার এ বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ মাত্র, আর তা এতেই পূর্ণ হতে পারে, তাই তার ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন নেই।

যদিও বর্ণমালার এ বৈশিষ্ট্য আরবী ভাষা ও অভিধান সংশ্লিষ্ট, তথাপি এটাও ঠিক যে, প্রাচীন আরবরা এ সব জানত না। অন্তত বিস্তারিতভাবে এগুলো জানত না। সাধারণ আরবদের তো কথাই নেই, বড় বড় ভাষাবিদও তা বুঝতে অক্ষম রয়েছেন। বস্তুত 'জিন্স' -এর সংজ্ঞা কিংবা তার মর্ম জিজ্ঞেস করলে অথবা বিভিন্ন বাক-বিন্যাসের বিশেষত্ব জিজ্ঞেস করলে, তার ওপরে আলোকপাত করতে তাঁরা ব্যর্থ হবেন। সেক্ষেত্রে সে সবের মূল তত্ত্ব বলা তো আরও কঠিন হবে। অথচ স্বভাবসুলভভাবে তাঁরা তা ব্যবহার করে যাচ্ছেন। তার মূল তত্ত্বের দিকে খেয়াল দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি।

তা ছাড়া আরবী ভাষায় যাঁরা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন, তাঁদের চিন্তার গভীরতার পরিমাপও সমান ছিল না। কেউ কেউ তো তাঁদের এত গভীর পন্ডিত ছিলেন যে, অনেকে সে সম্পর্কেই খবর রাখত না। এ বিদ্যা যদিও আরবী ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট, তথাপি এ স্তরে পৌঁছুতে অনেকেই অক্ষম ছিল।

মূল আলোচনা ঃ

এতটুকু ভূমিকা দেবার পরে হরুফে মুকাত্তআত সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার স্তরে পৌঁছা গেল। এখানে সবার আগে এ সত্যটি মনে রাখা চাই যে, তার মর্যাদা যে সূরার গোড়ায় এসেছে, তার সাথেই যুক্ত হয়েছে। বস্তুত যে সব কথা সূরাটিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, মোটামুটিভাবে তা গোড়ার অক্ষর কটায় নিহিত থাকে। যেমন, কোন গ্রন্থ লিখে তার একটা নাম রাখা হয়, আর সে নামের সাথে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর একটা যোগ থাকে, যাতে করে নাম শুনেই বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে। যেমন, আল্লামা বুখারী তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থের নাম রেখেছেন, 'জামেউস্ সহীহুল মসনদ ফী আহাদীসে রাসূল্লাল্লাহে (সঃ) আর এ নাম শোনামাত্র আমরা বুঝতে পাই যে, এ গ্রন্থে রসূল (সঃ) -এর সহীহ হাদীসগুলো সংকলিত হয়েছে।

الم। (আলিফ, লাম, মীম) ঃ বস্তুত এ হচ্ছে সূরার শিরোনাম। এর অর্থ হচ্ছে 'অদৃশ্য জগতের সেই গুপ্ত সত্য যা স্বস্থানে নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দৃশ্য জগতে অনির্দিষ্ট ছিল, এখন থেকে তা নির্দিষ্ট হয়ে গেল। الم। -এর যে অর্থ বলা

হল, তার ভিত্তি হল এই, 'হামযাহ্' ও 'হা' এ দু'টি বর্ণমালা অদৃশ্য বস্তুর অর্থ প্রকাশ করে। অবশ্য দূয়ের ভেতরে তফাৎ এতটুকু যে, 'হা' এর এ সম্পর্ক এ দুনিয়ার অদৃশ্য বস্তুর সাথে আর 'হামযার' সম্পর্ক এ সৃষ্টি জগত থেকে অদৃশ্য বস্তুর সাথে।

همزء (হামযাহ্) ঃ অন্যান্য বর্ণ মালার ভেতরে হামযার সম্পর্ক এমন অদৃশ্য বস্তুর সাথে যা অনির্দিষ্ট। তার প্রমাণ এই, সাধারণ কথাবার্তায় যখন এমন কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় যা এখনও অনির্দিষ্ট, তখন 'হামযাহ্' ব্যবহার করা হয়। প্রশ্নসূচক বাক্যের প্রারম্ভে তাই 'আম' তথা হামযাহ্ ব্যবহৃত হয়। আর এ ধরনের প্রশ্নসূচক বাক্য যখন অন্য কোন বাক্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়, তখনও 'আম' ব্যবহার করা হয়। তার প্রথম অক্ষর হামযাহ্। এ সংযোগ দ্বারা প্রমাণ করা হয় যে, যেই অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, তা এখনও অনির্ধারিত রয়েছে।

বস্তুত এ'ইস্তেফ্হাম' (প্রশ্নসুচক) ও 'আত্ফ্' (সংযোগমূলক) বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি প্রমাণ দেয় যে, যে বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তা আমাদের জ্ঞানের এখনও বাইরে রয়েছে।' তা অদৃশ্য ও অপরিজ্ঞাত। এ অনিশ্চয়তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায়। তখন 'ا' ব্যবহার করা হয় বাক্যের শুরুতে। তা প্রমাণ দেয়, যে অদৃশ্য ব্যাপার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তার একটা অস্পষ্ট ধারণা প্রশ্নকারীর রয়েছে আর তা অমুক বস্তু সম্পর্কিত।

ه (হা) ঃ সর্বনাম ও ইস্তেফ্হামের মতই। উভয়ের সংযোগ গায়েব বা অদৃশ্য বস্তুর সাথে। ইস্তেফ্হাম অজানা বস্তুর জন্যে হয়ে থাকে। সর্বনামেও এমন কোন বস্তু বা শব্দের স্থলাভিষিক্ত হয় যা অদৃশ্য অর্থাৎ বাক্যে অবর্তমান। সর্বনামের জন্য হা ব্যবহৃত হয়। যার অর্থই হচ্ছে অদৃশ্যের সাথে হা -এর সম্পর্ক নির্দিষ্ট অদৃশ্যের সাথে। সর্বনাম, স্পষ্ট বা অস্পষ্ট যে ভাবেই হোক নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এর অর্থ দাড়াল এই, হামযার সম্পর্ক দুনিয়া থেকে অদৃশ্য, অনির্দিষ্ট বস্তুর সাথে আর হা-এর সম্পর্ক দুনিয়ার ভেতরকার নির্দিষ্ট অদৃশ্যের সাথে।

ل (লাম) ঃ 'হামযাহ্' ও হা যে ভাবে অদৃশ্যের প্রমাণ দেয়, তেমনি লাম যার সাথে যুক্ত হয় সেটাকে নির্দিষ্ট করে দেয়। তাই যখন কোন অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্ট করতে হয়ে, তখন সে শব্দের সাথে ل যুক্ত করতে হয়।

م (মীম) ঃ মীমের সাথে যখন হামযাহ্ ও লাম মিলিত হয়, তখন তা এমন এক বাস্তব সত্ত্বার প্রমাণ দেয়, যার ভেতরে বিভিন্ন বস্তু সত্ত্বার সমাবেশ ও বন্ধন ঘটে। আর তা শূন্য জগত ছেড়ে এই দৃশ্য ও বাস্তব জগতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মোটকথা, এ তিন বর্ণমালার আলোচিত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একত্রে الم। (আলিফ লাম মীম) -এর অর্থ দাঁড়ায়, সেই অসীম প্রেরণা যা এতদিন শূন্য জগতেই আবদ্ধ ছিল, এখন তা সে জগত ছেড়ে এ দৃশ্যমান জগতে আশ্রয় নিল এবং এ জগতের রীতিনীতি ও মানবিক জ্ঞান অনুসারে নির্দিষ্ট হল। মানবতার কাঠিন্য ও কুটিলতা দূর করার কাজে নিয়োজিত হল। তাদের অবৈধ কাজ ও অন্যায় কথাকে সে শাস্তির ভয় দেখিয়ে দূর করতে চায়।

'আলিফ-লাম-মীম' -এর যে অর্থ বলা হল, যদি সম্পূর্ণ সূরাটি অনুধাবন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, তার আগাগোড়াই এ অর্থের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ভরপুর।

الر। (আলিফ-লাম-রা) ঃ দু'আয়াতে কেবল 'রা' ও 'মীম' এ তফাত। তাই এও প্রায় 'আলিফ 'লাম' 'মীম' এর বিশ্লেষণ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, 'আলিফ-লাম-রা' পুনরাবৃত্তি ও বার বার অর্থও প্রকাশ। সে হিসেবে এর অর্থ দাঁড়ায়– যেই অদৃশ্য একবার এ দুনিয়ায় নিশ্চিত হয়েছিল, সে অন্য দলের সাথে মিলে পুনরায় দুনিয়ায় এসে নতুনভাবে নিশ্চিত হল।

কুরআনে الر। দ্বারা সে বিদ্যাই বুঝায় যা বনী আদমের অন্যায় কাজ ও পাপচার দূর করার জন্য হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে একের পর এক নবীরা হিদায়াত ও সংস্কারের জন্যে শিক্ষা ও কর্মপন্থা অনুসরণ করেন তা সব কিছুই এ বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

طا و ا لصاد তোয়া ও সোয়াদ ঃ এ দুটো অক্ষরও কাছাকাছি অর্থবোধক। তা হল, উন্নতির দিকে পদক্ষেপ– অর্থাৎ এ জড় জগত থেকে উর্ধ্ব জগতে আরোহণ। তফাত এই, 'তোয়া' এর সম্পর্কে মানুষ্য গুনাবলী সহ উর্দ্ধ জগতে আরোহন তার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠতার সাথে আর 'সোয়াদ-এর উন্নয়ন হল পবিত্রতাও সুক্ষতার সাথে, অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য।

س (সীন) ঃ এ হরফ প্রমাণ করে যে, অপার্থিব জগতের যে অদৃশ্য শক্তি পার্থিব জগতে রূপ পেয়ে নির্দিষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছিল, এখন তা গোটা সৃষ্টি জগতে ছড়িয়ে গেছে।

طه (তোয়া-হা) 'তোয়া-হা' ও মুকাত্ত'আত আয়াত। ওপরে যে সব অক্ষরের বিশেষত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার ভেতরে দুটো অক্ষর 'তোয়া ও 'হা' পার্থিব উন্নয়ন ও মর্যাদা প্রমাণ করে। এ দুয়ে মিলে এমন এক স্থান নির্দেশ করে, যা নবীদের জন্যেই নির্দিষ্ট। অর্থাৎ নবীদের অপার্থিব জগতের দিকে আকৃষ্ট হওয়া ও তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার ফলে এমন এক অদৃশ্য অবস্থার সৃষ্টি হওয়া, যার ভেতরে সব সত্তার জ্ঞান মোটামুটি ভাবে মজুদ থাকে। অন্য কথায় 'তোয়া-হা' বলাতে নবীরা যে মর্যাদা বলে অপার্থিব জগতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং অনেক অজানা কথা জানতে পায়, তাকেই বুঝায়। আর সে সব বিদ্যা তাঁরা আল্লাহ্র তরফ থেকে যে গ্রন্থ পান, তাতে লিপিবদ্ধ থাকে।

طسم (তোয়া-সীন-মীম) এ তিন অক্ষরের ভেতরে 'তোয়া পার্থিব উন্নতি ও মর্যাদা, 'সীন' সৃষ্টি জগতে ছড়িয়ে যাওয়া ও 'মীম' নির্দিষ্টতা বুঝায়। এ তিনে মিলে নবীদের একটি বিশেষ স্তর বুঝায়। অর্থাৎ অপার্থিব জগতের দিকে পদক্ষেপের ফলে তাঁরা যে তত্ত্ব লাভ করেন, তা দ্বারা সেই তত্ত্ব বিদ্যা পার্থিব জগতে প্রকাশ ও ব্যাপ্তি লাভ বুঝায়। যেন তোয়া-সীন-মীম বলতে নবীদের লব্ধ জ্ঞান সারা জগতে প্রকাশ পেল ও ছড়িয়ে গেল।

حا (হা)-এর অর্থ ও 'ه' এর মত অদৃশ্য বস্তু। তফাত এতটুকু যে, 'ه' যে অদৃশ্য বস্তু নির্দেশ করে তা নেহাতই অদৃশ্য থাকে। পক্ষান্তরে 'ح' এমন অদৃশ্য বস্তুর দিকে ইংগিত করে যাতে আলোর ঝলক, প্রকাশের আভাস ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং যেখানে 'ح' আসবে, সেখানেই প্রকাশ ও বিশিষ্টতার দিকে ইংগিত করবে।

حم (হা-মীম) ঃ এ আয়াতের অক্ষর দুটি প্রায়ই কাছাকাছি অর্থবোধক। 'মীম' তো সংকোচন ও অনুসন্ধানের প্রমাণ দেয়। আর 'ح যদিও অদৃশ্যের দিকে ইংগিত দেয়, তথাপি তাতে আলোর ঔজ্জ্বল্য ও প্রকাশ অভিলাষ নিহিত রয়েছে। তাই حم দ্বারা এমন এক অদৃশ্য তত্ত্বের দিকে ইংগিত করা হচ্ছে, যাতে আলোকোজ্জ্বল প্রকাশ মহিমা রয়েছে। আর তা পার্থিব জগতের বৈশিষ্ট্য এ জন্যে অর্জন করেছে যে, মানুষের ভ্রান্ত ধারণা ও অন্যায় কাজগুলো সংশোধন করবে। এর থেকে কুরআনের সেই তত্ত্বটির দিকে ইংগিত করা হয়েছে যাতে বিভ্রান্তদের কথাগুলোর প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং তাদের অভ্যাস ও রীতি-নীতি এবং সর্ববিধ দ্বিধা সংশয়ের সমালোচনা করে সত্যের আলো প্রকাশ করা হয়েছে।

ع (আইন) ঃ এ অক্ষরটি উজ্জ্বল দ্যুতির প্রকাশ ও তার নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহের প্রমান দেয়।

ق(কাফ) ঃ মর্মের দিক থেকে এ অক্ষরটি 'মীম' এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। এটাও বিশেষত্ব ও নির্দিষ্টতার প্রমাণ দেয়। পার্থক্য শুধু এই, বিশেষত্ব ও নির্দিষ্টতার চরমত্ব বুঝায়। তার সব রূপই এতে ঠাই পেয়েছে। এ হিসেবে ق এর পূর্ণ অর্থ এই, আল্লাহ্‌র যে প্রেম বিন্দু বিন্দু প্রকাশ পাচ্ছিল, তা পুরোপুরি পার্থিব জগতে ছড়িয়ে পড়ল।

ن (নূন) ঃ এ অক্ষর দ্বারা আঁধারে আলোর বিকীরণ বুঝায়। অর্থাৎ 'নূন' আলো আঁধারের সেই অবস্থাটা প্রকাশ করে যা প্রত্যুষে বা সন্ধায় দেখা দেয়। ঠিক সেরূপ না হলেও কাছাকাছি বুঝায়।

ى (ইয়া) ঃ 'ইয়া' ও 'নূন' একই অর্থবোধক। তফাত এই, নূন' অর্থে আলোর প্রকাশ যতটুকু জোরালোভাবে বুঝায়, এখানে ঠিক ততখানি নয়। সংগে সংগে 'ہ' এর অর্থের সাথেও এর সাদৃশ্য রয়েছে। সেখানেও পার্থক্য এই যে, 'ہ' এর অর্থে নির্দিষ্টতা বেশী বুঝায়। 'ইয়া' মোটামুটি কম আলো ও নির্দিষ্টতা বুজায়।

يس (ইয়া-সীন) ঃ 'ইয়া' ও 'সীন' মিলে কিছুমাত্রায় নির্দিষ্ট আলো ছড়িয়ে যাওয়া বুঝায়। এ হিসেবে এর থেকে সেই তত্ত্ব ও মর্ম বুঝায়, যা গোটা সৃষ্টিতে ছড়িয়ে পড়ে।

ص (সোয়াদ) ঃ এ পর্যন্ত যা সৃষ্টি হয়েছে এ অক্ষরটি তার বিশেষ অবস্থা ও কার্যক্রম প্রকাশ করে। যখন নবীরা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের দিকে আকৃষ্ট হন, হোক তা প্রকৃতিগত কিংবা অর্জিত, তখনকার অবস্থানটিও প্রকাশ পায় এ অক্ষরে।

(কাফ) ঃ ق ও ك এ দু'অক্ষরে যে সমতা ও অসমতা রয়েছে, তাদের অর্থেও ঠিক তাই দেখা যায়। ك -এর উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও নরম। তাই কিছুটা স্বল্পতা ও দুর্বলতা নিয়ে সে ق-এর অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ কম শক্তি ও কম কাঠিন্য।

كهيعص (কা-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ) ঃ এ আয়াতটি এমন পাঁচটি অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত যার ভেতরে সাধারণ শক্তি ও কাঠিন্য, নির্দিষ্ট অদৃশ্য বস্তু, দ্যুতি, ঔজ্জ্বল্য, প্রকাশ, সূক্ষ্মতা ও পবিত্রতা ইত্যাদি সব একত্র হয়েছে। তাই এ আয়াত দ্বারা এমন এক বাস্তব অন্ধকার জগত বুঝায় যার ভেতরে এমন কিছু জ্ঞান সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে এবং কিছু জ্ঞান অস্পষ্ট ও অনুজ্জ্বল বিরাজ করছে।

সার কথা, মুকাত্ত'আত আয়াতের তত্ত্ব-জ্ঞানের এক বিরাট জগত লুকিয়ে আছে। কেবল আগ্রহ ও অনুভূতি শক্তিই তা অর্জনে সহায়তা করতে পারে। সেই সংক্ষেপ মর্মকে লেখা কিংবা আলোচনা দ্বারা যদি প্রকাশ করার কোন পথ থাকে, তা এ পুস্তকে অনুসৃত হয়েছে। এর চাইতে বেশী কিছু বলা বা বর্ণনা করা মানুষের সাধ্যাতীত।

এটাও সত্যি যে, যা কিছু বলা হল তা সে শব্দ ও বাক্যগুলোর মর্মের সাথে ষোল আনা সমঞ্জস্যপূণ্য নয়। তার যথাযর্থ মর্মও প্রকাশ পায়নি। কোন কোন দিক থেকে বরং মুল অর্থের পরিপন্থিও হয়েছে। কিন্তু আগেই স্বীকার করা হয়েছে, এর চাইতে বেশী বলা মানুষের সাধ্যাতীত। শুধু যা বলা সম্ভবপর ছিল তাই বলেছি এবং কোন্‌টা সঠিক তা আল্লাহ্‌ তায়ালাই বেশী জানেন।

(সমাপ্ত)